এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা

এম. ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০৯

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বেপারী
প্রফেসর
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

GIFT

Dhaka University Library
449222

449222

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক

নাজনীন নাহার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

M.

449222

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা

এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

449222
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বেপারী
প্রফেসর
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

গবেষক
নাজনীন নাহার

ডিসেম্বর ২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

449222

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

নাজনীন নাহার

নাজনীন নাহার
এম. ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাজনীন নাহার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত 'এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে নাজনীন নাহারের নিজস্ব এবং একক গবেষণাকর্ম। এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ শিরোনামের ওপর অভিসন্দর্ভ কোথাও কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয়নি।

এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য সন্তোষজনক। আমি এ গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বেপারী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার জীবনসঙ্গী
যিনি আমাকে সার্বক্ষণিক হৃদ্যতা ও সহযোগিতায় আগলে রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণালব্ধ এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি তাদের, যারা আমাকে এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। 'এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বেপারীর নির্দেশনা ও সহযোগিতায় সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। একজন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন ও শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমাকে অকৃপণভাবে সময় দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকসহ আরো অনেকের প্রতি, যারা বিভিন্ন সময় থিসিস রচনায় উপদেশ ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমার অভিসন্দর্ভের ড্রাফট পড়ে মন্তব্য ও প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য সুপারিশ করার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন শিক্ষকের সঙ্গে বিভিন্ন অধ্যায়ের তথ্যাদি নিয়ে মতবিনিময় করেছি। তাদের কাছেও ঋণী। তাছাড়া আমার বন্ধু সমতুল্য এম. ফিল, পি এইচ ডি গবেষকদের কাছেও ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এ গবেষাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এসব লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি এ গবেষণাকর্মে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছ থেকে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

নানাবিধ সমস্যা, বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করতে আমাকে যারা উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার লক্ষ্য

বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশে আমরা বেশ কয়েকবার সামরিক শাসনের আবির্ভাব হতে দেখেছি। দেখেছি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সামরিক শাসকদের ক্ষমতায় টিকে থাকতে। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন ছিলেন সুদীর্ঘ ৯ বছর। তার ক্ষমতা দখল ও শাসনামল সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো এরশাদের শাসনামল এবং সে সময়কালে বিরোধী দলগুলোর অবস্থান, কার্যক্রম, ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা, পর্যালোচনা, বিচার বিশ্লেষন এবং তথ্য উদঘাটন। পাশাপাশি সামরিক শাসনের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার গুরুত্ব

'এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা' আমার নির্বাচিত এ বিষয়টির ওপর গবেষণা করতে গিয়ে নির্দিষ্ট এ বিষয়টির ওপর বিস্তৃত ধারণা পাওয়ার মতো একক কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত না হলেও ওই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গবেষক ও লেখক তাদের বই এবং প্রবন্ধে সামরিক শাসন, এরশাদের ক্ষমতা দখল, দীর্ঘ ৯ বছর ক্ষমতার চর্চা, বিরোধী দলের অবস্থান, কার্যক্রম, সফলতা, ব্যর্থতা, ভূমিকার ওপর যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। সেসব গ্রন্থ, প্রবন্ধ, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রামাণ্য অংশ বিশেষের সহায়তায় আমি আমার গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করার প্রয়াস নিয়েছি। যেহেতু ওই বিষয়টি আমাদের দেশের রাজনীতিতে স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেহেতু আমি ওই বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। বর্তমান এ গবেষণা কাজে আলোচ্য বিষয়ে বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে জেনারেল এরশাদের শাসনামল অর্থাৎ ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ এবং গণঅভ্যুত্থান, এরশাদ সরকারের পতন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর। এ গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু এরশাদের শাসনামল এবং তৎকালীন সময়ে বিরোধী দলের ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে। তাই গবেষণার মাধ্যমে এরশাদ সরকারের শাসনামল সম্পর্কে বিশ্লেষণের পাশাপাশি তৎকালীন বিরোধী দলের কার্যক্রম, ভূমিকা, ব্যর্থতা ও সফলতা বিশ্লেষণ এরশাদ সরকারের পতন সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হলো। এর ফলে রাজনৈতিকদের পরস্পর একাত্মতার সুফল ভবিষ্যতের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে– এ প্রত্যাশা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার পদ্ধতি

এ গবেষণার জন্য প্রাথমিক (Primary) এবং মাধ্যমিক (Secondary) উভয় উৎস থেকেই তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাথমিক : গবেষণায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিলপত্র হলো এরশাদ সরকারের গোপনীয় পত্রাদি, সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্র, বিভিন্ন অধ্যাদেশ, সরকারি গেজেট, দলের গঠনতন্ত্র, নির্বাচনী মেনিফেস্টো, বিভিন্ন প্রচারপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধন, নির্বাচনী তফসিল, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, দেশি-বিদেশি সাময়িকী ও প্রামাণ্য, প্রকাশিত পুস্তকগুলো, গবেষণা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস ব্যবহার করা হয় এবং তৎকালীন বিরোধী দলে ছিলেন এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গবেষণা বিষয়গুলোর সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী – এদের সঙ্গে মতবিনিময় ও তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি।

মাধ্যমিক : প্রকাশিত পুস্তক, প্রবন্ধ এবং জার্নাল থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণার কাজ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের শাসনামলের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং বিরোধী দলের রাজনৈতিক কার্যক্রমের বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার বিষয়ের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।

প্রধান রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আমি সুনির্দিষ্ট একটি প্রশ্নমালা নথি (Questionnaries) প্রণয়ন করে প্রয়োগ করেছি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংগৃহীত তথ্যাবলির যাচাই করা এবং গবেষণার বিষয়ে তাদের প্রাসঙ্গিক ভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য এ প্রশ্নমালা নথির প্রয়োজন ছিল। একই সঙ্গে আমি বিষয়টির ওপর ব্যাপক জরিপ চালিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। পাশাপাশি ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পরিশেষে সংগৃহীত উপাত্তগুলো বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করতে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (Analytical Method) বিশেষ করে ঘটনাভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Case Analysis) অনুসরণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক শাসন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্ব থেকে আজ অবধি বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল ও নেতারা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পরিক্রমায় ছাত্র রাজনীতি তথা ছাত্র সমাজের ভূমিকা ও অবদান গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকে অদ্যাবধি বারবার সামরিক শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও নেতারা ছাত্র-জনতার সহায়তায় সামরিক শাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করে দেশ ও জাতিকে গণতন্ত্রের দর্শন করিয়েছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন গণতান্ত্রিক ধারা।

এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কিত আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে একদিকে যেমন সামরিক শাসন, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতা, বহিঃশক্তির প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। যা আমার এ গবেষণা কর্মের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে আমার গবেষণা সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক নেতাদের মতামত সংগ্রহে নানারূপ বাধার সম্মুখীন হই। এতে কিছুটা হলেও সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে।

গবেষণাকর্মটির সাক্ষাৎকার যেসব ব্যক্তির ওপর পরিচালনা করা হয় তারা প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়ায় তাদের মতামতে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দলীয় প্রভাবমুক্ত লেখাও খুব কম পাওয়া গেছে। ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত সব তথ্যই অবচেতন মনে হলেও আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যায়ন করেছি। পাশাপাশি পরিহার করার চেষ্টা থাকার পরও বিভিন্ন বিষয়ে কিছুটা হলেও আমার নিজস্ব মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার ক্ষেত্র

এ অভিসন্দর্ভের গবেষণা করতে গিয়ে রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক নেতাদের তথা বিরোধী দলের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর নেতৃত্ব, সততা, দেশপ্রেম, সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশীয় কিছু স্বার্থান্বেষী মহলের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের দেশগুলোর ইন্ধন ও প্রভাব সুস্পষ্ট হয়েছে গবেষণার মাধ্যমে। ভবিষ্যতে নতুন করে আবার আগের মতোই সামরিক শাসনের আবির্ভাব হতে পারে। সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্বার্থ ও উপাদান, সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থ ও উপাদান সম্পর্কে এ গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া সামরিক শাসন, রাজনৈতিক দল, নেতাদের সম্পর্কে বিভিন্ন দিকের ওপর বিশ্লেষণপূর্বক সম্ভাব্য ভবিষ্যৎও এ গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় স্বার্থান্বেষী মহল, বিদেশি গোষ্ঠীর স্বার্থ বাংলাদেশে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশীয় শক্তির পাশাপাশি বহিঃশক্তির প্রভাব ও স্বার্থ ব্যাপক। তাই বহিঃশক্তির প্রভাব ব্যাপকভাবে আলোচনার দাবি রাখা সত্ত্বেও অভিসন্দর্ভটির কলেবর একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে রাখার জন্য তা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যথার্থভাবে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে যথাযথ বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারে এবং সামরিক শাসনের পথ বন্ধ করে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্ত সার : অধ্যায় পরিক্রমা

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন গণতন্ত্র। এ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লাখো বাঙালি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং অকাতরে জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী দেশে একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সংসদীয় সরকারের সমাধি রচিত হয়। জনগণের মৌলিক অধিকার স্থগিত করে এবং সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ শাসন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত চালু ছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। তারপরই মোশতাক আহমদ ক্ষমতায় আসীন হলো। এরপর ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রকৃত সামরিক শাসন নিয়ে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হলো। তিনি এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে ১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হলে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ক্ষমতা গ্রহণ করেন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে। অতঃপর জেনারেল এরশাদ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে অপসারণ করে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। শুরু হলো এরশাদের সামরিক বেসামরিক শাসনামল, যা বিভিন্ন কলা-কৌশল, দমন পীড়ন, দুর্নীতি আর সামরিকীকরণের দীর্ঘ ৯ বছরের ক্ষমতা চর্চা। বিরোধী রাজনৈতিক জোট, দল, ছাত্র-জনতার আন্দোলন গণআন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তার শাসনামলের অবসান ঘটে।

ওই পটভূমিতে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ, ক্ষমতা দখলের কারণ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ ও এর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পটভূমি, কৌশল, কারণ ব্যাখ্যাসহ তার শাসনামলে অর্থাৎ এরশাদের বেসামরিকীকরণের পাশাপাশি তার সামরিকীকরণের সার সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : বিরোধী দল সম্পর্কিত সংজ্ঞা ও ধারণার পাশাপাশি বাংলাদেশের বিরোধী দলের ভূমিকা, কার্যক্রম, গণআন্দোল থেকে গণঅভ্যুত্থান সর্বোপরি এরশাদের পতন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এরশাদের শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা পর্যালোচনার পাশাপাশি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মীসহ আপামর জনগণের আন্দোলনের ঘটনাক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা ও ফলাফল সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

শেষ অধ্যায় : উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

১. ক.রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ: সামরিক বাহিনী কেন, কি কারণে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে ? ১০-৩৩

১. খ. বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ; ৩৩-৩৭

১. গ.বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ; ৩৭-৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. ক. ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ও এরশাদের ক্ষমতা দখল বিশ্লেষণ এবং সামরিক শাসন জারির কারন; ৪১-৫৭

২. খ. এরশাদের শাসনামল : বেসামরিকীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়া : ৫৮-৯৫

i. প্রাথমিক কর্মকান্ড; ৫৮-৬১

ii. ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন; ৬১-৬২

iii. ১৯৮৫ সালের গণভোট; ৬২-৬৩

iv. ১৯৮৫ সালের উপজেলা নির্বাচন; ৬৩-৬৪

v. জাতীয় পার্টি গঠন ও রাজনীতিতে এরশাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ;৬৪-৬৫

vi. তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন; ৬৫-৬৮

vii. ১৯৮৬ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন; ৬৮-৭০

viii. ১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন; ৭০-৭২

ix. সংবিধান সংশোধনী সমূহ; ৭২-৭৬

২. গ. এরশাদের সামরিকীকরণ; ৭৬-৯৫

তৃতীয় অধ্যায়

৩. ক. বিরোধী দল; ৯৮-১০৩

৩. খ. বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা; ১০৪-১০৯

৩. গ. বিরোধী দলের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা ও কার্যক্রম; ১১০-১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা পর্যালোচনা

৪. ক. গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াশে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা; ১৪৯-১৫০

৪. খ. বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটের ভূমিকা; ১৫১-১৫৩

৪. গ. ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র সমাজের ভূমিকা; ১৫৪-১৫৭

৪. ঘ.এরশাদ শাসনামলে গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান ১৯৯০ এবং সামরিক ও স্বৈরশাসনের পতন; ১৫৮-১৬০

৪. ঙ. ১৯৯০ সালের আন্দোলনের ঘটনাক্রম ও গণঅভ্যুত্থান পর্যালোচনা; ১৬১-১৭০

পঞ্চম অধ্যায়

সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা ও ফলাফল ১৭১-১৮২

উপসংহার ১৮৩-১৮৫

গ্রন্থপঞ্জি ১৮৬-২০৪

পরিশিষ্ট-১ ২০৫-২০৬

পরিশিষ্ট-২ ২০৭-২০৮

পরিশিষ্ট-৩ ২০৯-২১০

পরিশিষ্ট-৪ ২১১-২১২

পরিশিষ্ট-৫ ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা (Introduction)

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম দেশ। যার অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর গুরুত্ব বিশ্ব রাজনীতিতে অপরিসীম। ঔপনিবেশবাদের পতনের পর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো স্বাধীনতা লাভ করে বিশ্ব মানচিত্রে নিজেদের নিজস্বতায় ও স্বকীয়তায় স্বাধীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু করে। নানাবিধ সমস্যা ও ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এ দেশগুলোর মধ্যে কিছু একই রকমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

দক্ষিণ এশিয়া মূলত প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। এ সময়ে যেভাবে ইউরোপে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেমন : পার্লামেন্ট, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং রাজনৈতিক দল শক্তিশালী হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনে থাকার কারণে এশিয়া অঞ্চলে সেভাবে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি।

ব্রিটিশরা এসব দেশকে কেবলই শাসন ও শোষণ করেছে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তারা তাদের স্বার্থে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করেছে, কলোনিয়াল শাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছে। তাতে এসব দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো শক্তিশালী হতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে।

দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম দেশ বাংলাদেশ। বিশ্ব মানচিত্রে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতের যে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বাঙালি জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল আজকের বাংলাদেশ তার একটি অংশমাত্র। এ অঞ্চল ও এর মানুষ নানা রকম সমাজ বা স্বতন্ত্র জনপদে বিভক্ত ছিল। নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে একটি ভৌগোলিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কালক্রমে বঙ্গ থেকে বাঙাল বা বাংলা, সুবে বাংলা, নিজামত, বেঙ্গল, পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান এবং পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অভ্যুদয়।[১]

বাংলা তথা ভারতে প্রায় ২০০ বছর ধরে ব্রিটিশ শাসন ছিল খুবই ঘটনাবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ। জীবন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য সব ক্ষেত্রে এ সময়ে পাশ্চাত্য আধুনিকতার স্পর্শ লাগে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে চিরায়ত প্রায় স্বনির্ভর ও স্বনিয়ন্ত্রিত

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ সমাজ দ্রুত ভেঙে পড়েছিল। কোম্পানি শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি ও রাজস্ব ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর লুণ্ঠন, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক কথায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিঘাতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল জঙ্গি কৃষক বিদ্রোহ। এসব কৃষক বিদ্রোহ বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিক হলো, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অভূতপূর্ব প্রসার। বিভিন্ন সংস্কার, বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সমাজ সংস্কার, চাকরি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করে।[২]

এ দেশীয় জনগণ যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে বুঝতে পারে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নিজেদের দেশে গণতন্ত্র চর্চা, মৌলিক অধিকারের চর্চা করছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করছে এবং প্রতিষ্ঠা করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আর শোষণের স্বার্থেই শাসিত দেশগুলোতে অনুপস্থিত রেখেছে এসব কাঠামো। তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী থেকেই নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং প্রছন্নভাবে হলেও সর্বভারতীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা মুক্ত হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত প্রয়াসে বাঙালি জাতিসত্তা ভিত্তিক রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা হয়।

আমাদের বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের যে সংগ্রাম তা গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রাম। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশের ইংরেজ বিরোধী যে আন্দোলন তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বাঙালিরা।

বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগণ। পূর্ব বাংলার জগণের রয়েছে দীর্ঘ এক সংগ্রামী ইতিহাস। বিশেষ করে এ অঞ্চলের জনগণ ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক সচেতন। মহামতি গুখেলের মন্তব্যে তা প্রতীয়মান হয়। গুখেল বলেন, 'What Bengal think today the rest of India think tomorrow.' ইহাতে প্রমাণ হয় বাঙালিরা আজ যা ভাবে পুরো ভারতবর্ষ তা পরে ভাবে। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলো পরিলক্ষিত হয়।

ব্রিটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর' এ প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও একদিকে উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮) আলীগড় আন্দোলন, বাংলার নবাব আবদুল লতিফের (১৮২৮-১২৯৩) 'দি মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩), সৈয়দ আমির আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৭), মুসলমানদের জন্য নিখিল ভারত মুসলীম লীগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬), হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিভাজন রেখার ১৯০৫

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলার আঞ্চলিক বিভক্তি বা বঙ্গভঙ্গ, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা (Separate Electorates), লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৬), খিলাফত, অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২), সি আর দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩), ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন প্রজা আন্দোলন ও কৃষক প্রজা পার্টি (১৯৩৬), ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা (১৯৪১-৪৩), ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০), 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠনের সুপারিশ, ১৯৪৬ সালের নির্বাচন উত্তর কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াশ এবং দেশ বিভাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম-শরৎ বসু, কিরণ শংকর রায়ের 'অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ইত্যাদি ঘটনা তারই সাক্ষ্য।[৩]

তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির প্রায় ২০০ বছরের শাসন-শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত নামের ২টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হলো।[৪]

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) যে স্বাধীনতা লাভ করে তা মূলত আরেক ঔপনিবেশিক শাসনেরই রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পাকিস্তানে ব্রিটিশ কায়দায় পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শাসন, শোষণ, নিপীড়ন চালাতে থাকে। লাহোর প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হলেও পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী তা ভুলে গিয়ে বাংলাকে কলোনি হিসেবে শাসন ও শোষণ করতে থাকে।[৫]

অবশ্য ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সঙ্গে বাঙালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম এক নতুন আঙ্গিক লাভ করে। তৎকালীন পাকিস্তানি (১৯৪৭-১৯৭১) আমল ছিল এ সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব।

রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬%-এর বেশি লোক বাংলা ভাষা ভাষী হলেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মার্চ মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন এবং রেসকোর্স ময়দানে এক ভাষণে বলেন, 'Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan.' (উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা)। উপস্থিত ছাত্র-জনতা সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ জানায়। এরপর থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চাঙ্গা হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ২৫ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন

Dhaka University Institutional Repository

উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। নাজিমুদ্দিনের এ ঘোষণার প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন এবং দেশব্যাপী সেদিন হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৬]

সরকার সেদিন ১৪৪ ধারা জারি করে। এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্ররা মিছিল বের করে এবং পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, শফিকসহ আরো অনেকে নিহত হন। পাক শাসক গোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর থেকে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কারণ সে সময় সরকার বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল ছিল আওয়ামী লীগ।

১৯৫৪ সালে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।[৭]

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় সূচিত হয়। অন্যদিকে, মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সামান্য কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়।[৮]

আবার শুরু হয় বাঙালিদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানের সংবিধান প্রবর্তন করে। ১৯৫৮ সালে সেনাপ্রধান আইয়ুব খান সংবিধান বাতিল করে সামরিক আইন জারি করেন। সেই সঙ্গে পুরো পাকিস্তানে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এভাবে বারবার যখন বাঙালি তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো, এরই পথ ধরে শুরু হলো অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। অর্থাৎ স্বাধিকার আন্দোলন। এ লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি সংবলিত ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন।[৯]

৬ দফাগুলো নিম্নরূপ

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেল রূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। সব নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইন সভাগুলোর সার্বভৌমত্ব থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার– এ ২ বিষয় থাকবে। অন্য সব বিষয়ে অঙ্গ রাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩. এ দফায় মুদ্রা সম্পর্কে ২টি বিকল্প প্রস্তাব রয়েছে। তার মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করলেই চলবে।

ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ২টি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এ অবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ২ অঞ্চলের জন্য ২টি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে।

খ. ২ অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে। যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। ২ অঞ্চলে ২টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪. সব ধরনের ব্যাংক, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউয়ের নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যাল জমা হয়ে যাবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকগুলোর ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিলে যাবে।

৫. এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নরূপে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়।

ক. ২ অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

খ. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

গ. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা ২ অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারে আদায় করতে হবে।

ঘ. দেশজ দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলবে।

ঙ. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করতে হবে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে বাঙালির সার্বিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশবাসীর সামনে উপরোক্ত ৬ দফা কর্মসূচি তুলে ধরেন। এ ৬ দফার সঙ্গে ছাত্র সমাজের ১১ দফা কর্মসূচি যুক্ত হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের নতুন গতির সঞ্চার হয়। একে থামানোর জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৯৬৮) আশ্রয় নেয় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী। বাঙালির জাতীয় মুক্তির চেতনায় গণজোয়ার আসে। সংগঠিত হয় ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে।[১১]

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি।[১২]

পাক কর্তৃপক্ষের নানা রকম ছলচাতুরী চলতে থাকে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ বাঙালিকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করে।

২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্বিচারে আক্রমণ চালালে বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের কিছু পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে সরাসরি স্বাধীনতার ডাক দিয়ে পাক বাহিনীর হাতে বন্দি হন। ৯ মাসব্যপী সশস্ত্র ও গৌরবজনক এক মুক্তিযুদ্ধের শেষে হানাদার মুক্ত হয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৩]

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের নেতৃত্ব হাতে নেন শেখ মুজিবুর রহমান।[১৪]

স্বাধীনতার ৯ মাসের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং ওই সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। তবে এ ব্যবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে চালু হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা। মৌলিক অধিকার রহিত হয়। শুধু একটি রাজনৈতিক দল (বাকশাল) ছাড়া সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু মাত্র ৮ মাসের মধ্যে সেই ব্যবস্থাও পর্যুদস্ত হয় এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সংগঠিত এ অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের ২ প্রবাসী কন্যা ব্যতীত

Dhaka University Institutional Repository

তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করে মুজিবের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য খন্দকার মোশতাককে দিয়ে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন।[১৫]

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর বাংলাদেশে দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এর নেতৃত্ব দান করেন খালেদ মোশাররফ। তিনি রেডিও এবং টিভি ভবনসহ ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং সামারিক বাহিনীর স্টাফ প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করেন। তিনি নিজেই সামরিক বাহিনীর স্টাফ প্রধানের পদে উন্নীত হন।[১৬]

খন্দকার মোশতাক আহমদ পদত্যাগ করেন এবং বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হন। খালেদ মোশাররফ মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করেন। জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন এবং দেশে সামারিক আইন জারি করেন। ৭ নভেম্বর এর অভ্যুত্থানে তিনি দলবলসহ পরাজিত হন এবং শেষ পযর্ন্ত নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সংগঠিত সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত হলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন।[১৭]

শুরু হয় জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন। জিয়াউর রহমানের শাসনকালকে ২ ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় মূলত সামরিক শাসন (Martial law)। এ পর্যায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় পর্যায়কে জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া (Civilianization Process) বলে চিহ্নিত করা চলে। এ প্রক্রিয়া ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে ১৯৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সদস্যের হাতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিহত হন। বিএনপির নেতৃত্বে বিচারপতি সাত্তার ক্ষমতা গ্রহণ করেন।[১৮] বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সারা দেশে জারি করেন সামরিক আইন।[১৯]

এভাবেই সামরিক শাসন জেঁকে বসে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে চলতে থাকে লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বেসামরিকীকরণ ও সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার শাসন ব্যবস্থা। পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলতে থাকে এরশাদ বিরোধী কার্যক্রম ও আন্দোলন। পরবর্তী সময়ে যা

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দলগুলো ও ছাত্র-জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মুক্তির পথ প্রশস্ততায় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সংসদীয় পদ্ধতির সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যক্রম।

পাদটীকা

১. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০১, পৃষ্ঠা-১৯।

২. ড. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

৩. ড. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২১।

৪. A. K Chowdhury, The Independence of East Bengal, Jatiya Grantha Kewndra, Bangladesh, 1984, P. 88-90.

৫. মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ১৭৪৭-৫৭, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২১৭।

৬. মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২২।

৭. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (রাজনৈতিক ইতিহাস-১ম খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। ঢাকা ১৯৯০ পৃষ্ঠা-৫৯-৭০।

৮. Najma Chowdhury, The Lagislative Porcess in Bangladesh Politics and Functioning the East Bangladesh Legistlature 1947-58, Unversity of Dhaka, 1980, P-22.

৯. মো. মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশন ১৯৯৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৫০, ১৭২, ১৮৬।

১০. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৮-৯।

১১. লেলিন আজাদ, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা-১৯৯৭। পৃষ্ঠা-৬৫৫, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৩১।

১২. Rangalal Sen, Political Elites in Bangadash, University Press limited, Dhaka. April 1986. A 263.

Dhaka University Institutional Repository

১৩. সালাউদ্দিন আহম্মদ ও অন্যান্য (সম্পা.), বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৭।

১৪. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.। ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১১৫-১১৭।

১৫. ড. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৫।

১৬. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫।

১৭. মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীর বিক্রম, একজন জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য স্বাধীনতার প্রথম দশক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-১০৮।

১৮. ফেরদৌস হোসেন, রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, প্রথম সংখ্যা ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৬৪।

১৯. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৮০।

২০. মেজর রফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের ৯ বছর, ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-১৯৯১, পৃষ্ঠা- ৪৫-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১. ক. রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ : সামরিক বাহিনী কেন, কি কারণে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে?

একটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বজায় রাখা সামরিক বাহিনীর পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এমতাবস্থায় রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক ঘটনা। তথাপি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি দেশে কম-বেশি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে শুরু করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

বলা বাহুল্য, সামরিক বাহিনী যে কেবল উন্নয়নশীল তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রভাবশালী তা নয়, বরং উন্নত দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় নেতারা সামরিক বাহিনীকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারেন না। তদুপরি বৃহৎ শক্তিবর্গের সামরিক প্রতিযোগিতা বিশ্ব শান্তিকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিন্যাসের সংঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলেই দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করেনি এমন উন্নয়নশীল দেশের সংখ্যা আজকার বিশ্বে নেহায়েতই অল্প। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৫৮-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার ৪১টি রাষ্ট্রের মধ্যে ২১টিতে অর্থাৎ ৫৬ ভাগ রাষ্ট্রে, ল্যাটিন আমেরিকার ২০টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৩টিতে অর্থাৎ ৬৭ ভাগ রাষ্ট্রে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ২২টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৯টি রাষ্ট্রে অর্থাৎ ৪১ ভাগ রাষ্ট্রে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ১৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬টিতে অর্থাৎ ৩৭ ভাগ রাষ্ট্রেই সামরিক বাহিনী রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে।[২]

কোনো কোনো রাষ্ট্রে আবার বারবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান এক সমীক্ষায় বলেন, '১৯৬১ সালে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের শতকরা ১২ ভাগ সামরিক স্বৈরশাসনের অধীন ছিল। ১৯৬৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯ ভাগ এবং ১৯৭৩ সালে বেড়ে হয় ২৭ ভাগ । এভাবে দেখা যায়, ৭০-এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের প্রায় ৫৬% দেশ সামরিক শাসনের অধীনে চলে যায়।' তাই তিনি বলেন- 'The large percentage of

Dhaka University Institutional Repository

states that have fallen under military rule indicates the spread of political power wielded by the military in the third world.'

এরূপ সামরিক হস্তক্ষেপ ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল সাম্প্রতিককালে এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিগত কয়েক দশক যাবৎ রাষ্ট্র ক্ষমতায় সেনা নায়কদের উপর্যুপরি আগমন এবং প্রস্থান আর পুনর্গমনের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ক্ষমতায় সামরিক কর্তৃপক্ষের শাসন সংক্রান্ত বিষয়টি রাজনীতি বিশ্লেষণে ব্যাপক গুরুত্ব লাভ করেছে। এ কারণেই প্রখ্যাত সামাজতাত্ত্বিক মরিচ জানোইচ (Morris Janowitz) প্রায় ২৫ বছর পূর্বে যথার্থই বলেছিলেন, যেসব সাংগঠনিক ও পেশাগত যোগ্যতা, কৌশল নতুন সরঞ্জাম ইত্যাদি সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কিংবা কুক্ষিগত করতে সাহায্য করে সুচারুরূপে দেশ পরিচালনায় এসবই সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়ায়।[৪]

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলো মূলত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর পরিবর্তিত অবস্থায় দলীয় ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে জাতি গঠনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা, ঐকমত্যের অভাব, বৈধতার সংকট, অংশগ্রহণের সংকট, অনুপ্রবেশের সংকট, বণ্টন সংকট প্রভৃতি। পাশাপাশি দলাদলি, কোন্দল, রাজনীতিবিদদের অযোগ্যতা, জাতীয় সংহতিগত সমস্যা প্রভৃতি রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা বিরাজ করে। আর এ দুর্বলতার সুযোগ নেয় সামরিক বাহিনী।

ঔপনিবেশিক শাসন প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশেই একটি সুদক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনী উপহার দিয়ে যায়। যা ওই সব দেশের অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে সব দিক থেকে উন্নত। আর যেখানে সামরিক বাহিনী একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে থাকে না সেখানে স্বাধীনতার পর অতি দ্রুত একটি সুদক্ষ সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এসব দেশের জনগোষ্ঠীর কাছে সামরিক বাহিনী মূলত স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং সাম্যের প্রতীক। তারাই জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতিভূস্বরূপ। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা একটি বিশেষ স্বার্থের স্বপক্ষে কাজ করে এবং ওই স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়োজিত থাকে। সমালোচকরা এটাকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শাসন-শোষণকে টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার বলে উল্লেখ করেন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক অভ্যুত্থান বা হস্তক্ষেপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী S. E. Finer বলেছেন, 'The armed forces constrained substitution of their own policies and or their persons for those of the recognized civilian authorities. '

সামরিক হস্তক্ষেপ বলতে বোঝায় সামরিক বাহিনী যখন তাদের পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অবজ্ঞা করে জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয় তখন তাকে সামরিক হস্তক্ষেপ বা সামরিক অভ্যুত্থান বলে। Armes perlmuller-এর মতে, 'Military intervention in politics means the involvement of officers in the making of national policy outside the area of national defence.'

মূলত রাজনীতি বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ বলতে বেসামরিক সরকারের কাছ থেকে সামরিক বাহিনী কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল অথবা সামরিক বাহিনীর মনঃপূত কোনো বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখাকে বুঝায়। S. E. Finer তার Man on Horse Back গ্রন্থে ৩ ধরনের Military Rule-এর কথা বলেছেন|

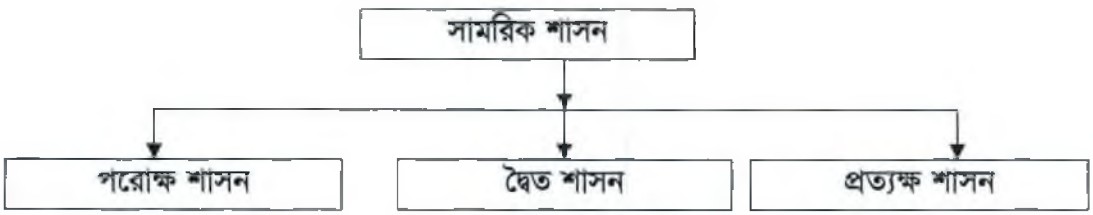

পরোক্ষ সামরিক শাসন : এটি মূলত সেই শাসন ব্যবস্থা যেখানে সামরিক জান্তারা সরাসরি ক্ষমতা দখল না করে বেসামরিক নেতাদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং নীতিনির্ধারণে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়। J. C. Johari বলেন, 'where the military leader have a definite influence upon the civilian govt. and there by mould its policy according to their will ... is call indirect military rule.'

এ শাসন ব্যবস্থাকে Quasi military or quasi civilian বলা হয়। এ শাসন ব্যবস্থায় সামরিক নেতারা পর্দার অন্তরালে থেকে কাজ করে এবং চলমান সরকার থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। কিন্তু ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈত সামরিক শাসন : একটি দেশের Administration সম্পর্কে সামরিক বাহিনী তেমন জ্ঞাত নয়। তাই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশ পরিচালনার স্বার্থে বেসামরিক আমলাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে বেসামরিক আমলাদের অধিক সুযোগ-সুবিধা অথবা তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সামরিক বাহিনী তাদের দেশ পরিচালনার কাজে ব্যবহার করে থাকে। এ ধরনের শাসনই dual Rule.

প্রত্যক্ষ সামরিক শাসন : এ শাসন ব্যবস্থায় সামরিক সরকারের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে নীতিনির্ধারণ ও নীতি প্রণয়নে সামরিক নেতারাই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। J. C. Johari এ সম্পর্কে বলেন, 'when there is civilian government the military leaders are the supreme decision maker.'

মূলত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ বেশি দেখা যায়।

Principles of constitutionalism-এর ভিত্তিতে Military Rule ২ ধরনের

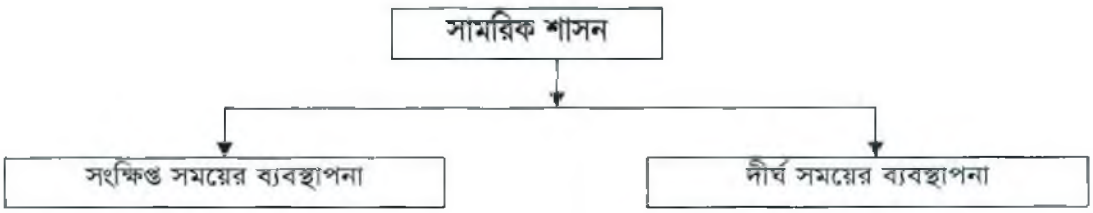

সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবস্থাপনা:

একটি দেশের রাজনৈতিক অর্থ ব্যবস্থা যখন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন দেশের অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনার জন্য সামরিক বাহিনী সাময়িক সময়ের জন্য ক্ষমতা দখল করে। তারা ক্ষমতায় এসে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করে ও নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যায়। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে এ রকম Short Term Intervention ঘটেছিল।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবস্থাপনা:

এ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী একটি বিশেষ মুহূর্তে ক্ষমতা দখল করলেও তারা দীর্ঘমেয়াদি দেশ শাসনের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল না থাকে সেসব দেশে এ ধরনের সামরিক হস্তক্ষেপ হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

S. P. Huntington-এর ধারণা : বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সাড়া জাগানো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী S.P. Huntington মনে করেন, একটি দেশে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ অভ্যুত্থানের মধ্যেই সাধারণত দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও পর্দার অন্তরালে থেকে কখনো কখনো তারা দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। S. P. Huntington-এর মতে ৩ ধরনের Military rule হতে পারে।

১. Place Revolution.

২. Revolutionary Coup.

৩. Reform Coup.

S. E Finer তার 'Man on Horse Back' গ্রন্থে রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপকে এভাবে ভাগ করেছেন

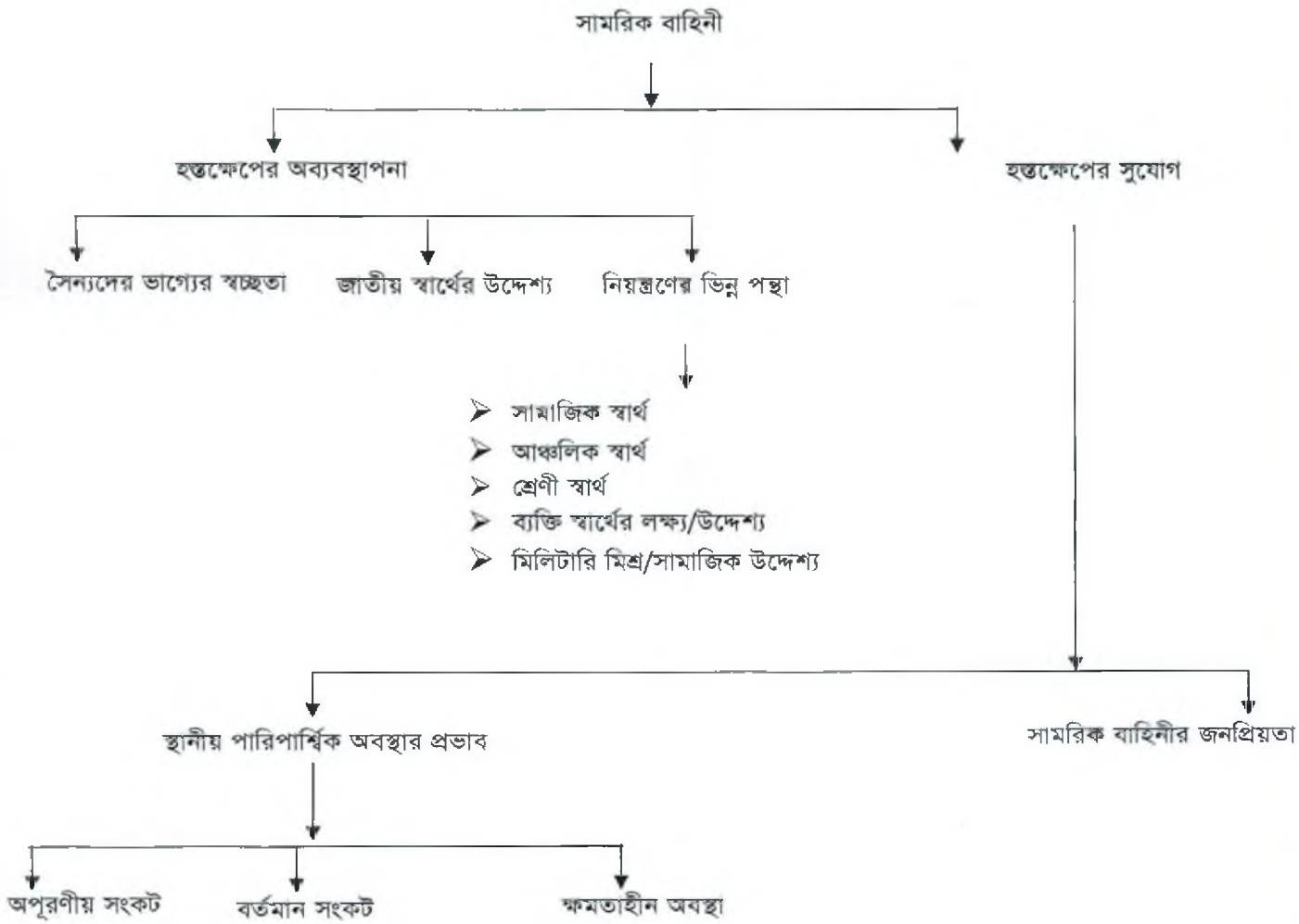

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে Military Rule-এর ধারণার পাশাপাশি বিজ্ঞজনরা পেশাদারি ও সামরিক পেশাদারিত্বের সম্পর্কে সংজ্ঞা ও ধারণা পেশ করেছেন সামরিক বাহিনী ও শাসন সম্পর্কিত ধারণাকে সুস্পষ্ট করার মানসে

Professionalism বলতে বুঝায় নিজ নিজ পেশায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন ও পেশাগত উৎকর্ষতা সাধন, অন্যদিকে Military Professionalism হচ্ছে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করা। এর মানে দক্ষতা ও বাহিনীগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত না থাকাই হচ্ছে সামরিক বাহিনীর সবচেয়ে বড় পেশা দারি মনোভাব।

Morris Janowitz এর মতে, 'Professionalism clearly means that the conduct of walfare is given over to men who have committed themselves to a career of service men and who are recognized form their expertise.'

S.P Huntington বলেন, 'The military is a professional body because they poses expertness. Social responsibility any corporateness. '

S. E. Finer বলেন, 'In practically every country of the world today except possibly in one or two the proto dynastic survivals such as yemen, the army is marked by the superior quality of its organization.'

পেশাগত সংগঠনের বিচারে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সেনাবাহিনী তুলনামূলক সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। Military officer-এর পেশাদারিত্ব ও একজন Lawerg বা Icaeber-এর মতোই উচ্চমাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। আধুনিককালে সামরিক বাহিনীর পেশাদারিত্বের কথা বলতে গিয়ে তাই Huntington বলেছেন, 'The modern officer crops is a professional body and the modern military officer is a professional man.'

J. Wheeler & Bennett-এর মতে, 'The military build up a conciourness that they any as the serventy of the state that is called military professionalism.'

Dhaka University Institutional Repository

S. E. Finer-এর মতে, 'Military professionalism in the loyalities of the army member upon the military law and ideology.'

Talukder Moniruzzaman বলেন, 'Professionalism is the creation act new loyalities and values among military men that under cut their prinodial scufiments. The professional army is, thus, a highly cohensive and disciplined organization.'[6]

অতএব একটি সুশৃঙ্খল ও জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন হিসেবে সামরিক বাহিনী বেসামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে গতানুগতিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে যে কোনো রাষ্ট্রের।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের পেছনে বিবিধ কারণ বিদ্যমান। যেসব রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানী রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ নিয়ে গবেষণা করেছেন, গ্রন্থ লিখেছেন, তাদের মধ্যে S. E. Finer, Morris Janowitz, S. P. Huntington, J. Johnson, Prof. Myron Weiner, লুসিয়ান ডবিৰউ পাই, ম্যারিয়ান লেভি, কোহন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উলেখ্য। এদের মতে, সামরিক বাহিনীর জাতীয় অনুগত্য নিয়ম শৃঙ্খলাবোধ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এদের সাংগঠনিক শক্তির পাশাপাশি রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ।[৭]

রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী কেন হস্তক্ষেপ করে এ বিষয়ে একাডেমিক পরিসরে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা তাত্ত্বিকরা ৩টি School of thought প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেনা হস্তক্ষেপের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন :

ক. Organizational School : এদের মতে, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সাংগঠনিক ভিত্তির কারণে সামরিক বাহিনী Civil politician দের চেয়ে নিজেদের যোগ্য মনে করে। যার ফলে তারা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। মরিচ জানোইচ, ক্লাউডসি উয়েল, স্যামুয়েল নিকানো এ তত্ত্বের অনুসারী। এ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে Morris Janowitz বলেন, 'The organizational

Dhaka University Institutional Repository

format designed to carryout the military functions as well as experience in the management of violence is at the root of these armies ability to intervence politically.'

খ. Systematic weakness : এ তত্ত্বের অনুসারীরা সামগ্রিকভাবে সামাজিক অবস্থাকে সামরিক শাসনের জন্য দায়ী করেন। S. E. Finer-এর মতে, 'Military intervention resutlts from the low minimal political cuture of the society concerned.'

গ. Behaviouralist School : এরা সামরিক বাহিনীর Internal political behaviour কে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের জন্য দায়ী করেন। স্যামুয়েল ডিকালোসহ বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিক এ মতের অনুসারী। এদের মতে, সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরীণ পদক্রম। সামরিক বাহিনীর মধ্যে উপদল, Corporate interest ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা, কোনো বিশেষ সেনাকর্তার মানসিক বিশেষত্ব ইত্যাদি বিষয়ের কারণে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

উলেক্ষ্য, তত্ত্বের অনুসারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

* Johnson-এর মতে, ৩টি কারণে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

প্রথমত. সামরিক বাহিনী সুদৃঢ় সংগঠন। (The armed forcess are highly organized)

দ্বিতীয়ত. সামরিক বাহিনী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম । (They are capable to build up democratic ground of a country)

তৃতীয়ত. সামরিক বাহিনী আধুনিকতাকে ধারণ করে। (The military bears modernity)

D. A Rustaw বলেন, ৫টি কারণে সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। যথা :

১. সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা (Weakness of the goverment)

২. ব্যক্তিগত আকাঙ্খা (Personal desire)

৩. দলীয় স্বার্থ (Coporate interest)

৪. তাৎক্ষণিক ঘটনা (Occasion/instable position)

Dhaka University Institutional Repository

৫. সমাজের অসম উন্নয়ন (Improper development of the society)

Prof Myron Weiner-এর মতে, ৩টি কারণে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

১. সামরিক বাহিনীর মধ্যে জাতীয় আনুগত্য বোধ বিদ্যমান।

২. সামরিক বাহিনী দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

৩. সামরিক বাহিনী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি পরায়ণ এবং এরূপ ব্যক্তিই তাদের প্রতি আস্থাশীল তারা দেশকে আধুনিকীকরণে উৎসাহী, কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকলাপে যারা সন্তুষ্ট নয়।

S. P. Huntington বলেন, 'জনগণের ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দাবি-দাওয়া পূরণে ব্যর্থ হলে যে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে উৎসাহ জোগায়।

S. E. Finer তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'The man of Horse back', 'The Rule of the military in politics'- নামক গ্রন্থে রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অভিপ্রায় এবং সুযোগ এ ২টি উপাদানের ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তার মতে, যেখানে হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায় ও সুযোগ কোনোটিই না থাকে যেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটবে না। যেখানে এ উপাদানের যে কোনো একটি উপস্থিত থাকে সেখানেও সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হতে দেখা গেছে আর যেখানে অভিপ্রায় এবং সুযোগ এ ২টি উপাদানই বিদ্যমান তাহলো সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার প্রকৃষ্ট অবস্থা।

এছাড়া S. E. Finer রাজনীতিতে সামরিক হাস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে ৩ ধরনের School of thought অর্থাৎ বিভিন্ন কারণের কথা বলেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

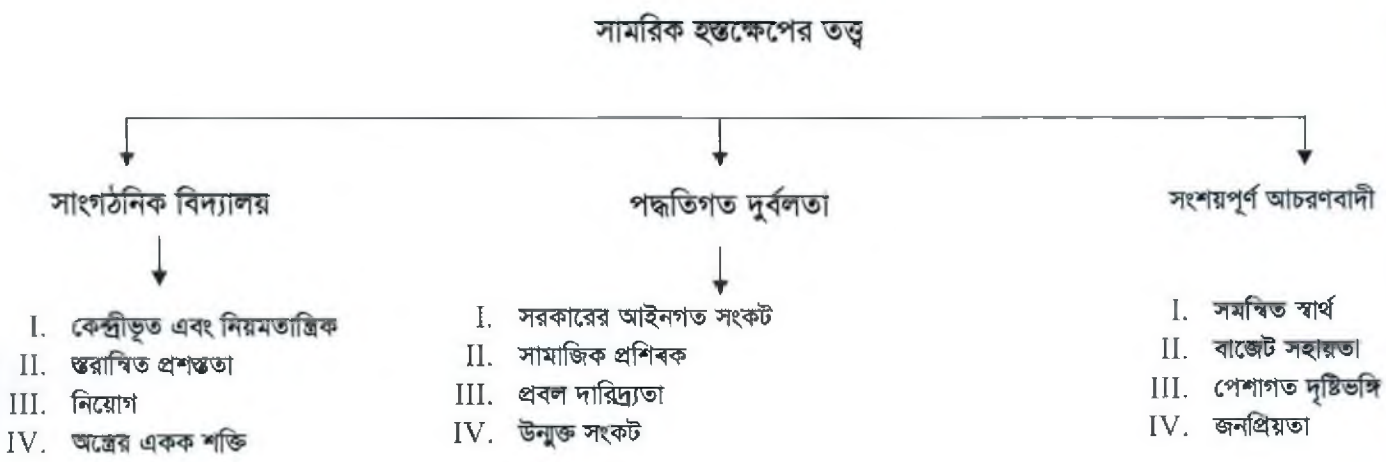

সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ

উন্নয়শীল দেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের পেছনে শুধু যে সামরিক কারণই নিহিত থাকে তা নয়, বরং রাজনৈতিক কারণসহ বহুবিধ কারণে এ হস্তক্ষেপ ঘটে থাকে যেমন :

সাংগঠনিক কারণ : উদ্দেশ্য ও গুণগত দিক দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের সামরিক বাহিনী উন্নত বিশ্বের সামরিক বাহিনীর চেয়ে তুলনামূলকভাবে পেছনে থাকলেও তৃতীয় বিশ্বের সামরিক সংগঠন নিজ দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে অনেক সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ। তৃতীয় বিশ্বের সামরিক সংগঠন বেসামরিক সংগঠনের তুলনায় ৩টি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ভোগ করে

ক. লক্ষ্যণীয় সংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্ব;

খ. আবেগঘন প্রতীকধর্মী মর্যাদা;

গ. আধুনিক প্রচলিত ও অপ্রচলিত বৈচিত্র্যময় অস্ত্রের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য।

তাছাড়া সন্ত্রাস দমনে (Management of violence) সামরিক সংগঠনের অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই।

সামরিক বাহিনীর সংগঠনে বিদ্যমান শৃঙ্খলা, পদসোপান, ঐক্যবদ্ধ নির্দেশ দান কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায় ঐক্য এসব কিছু সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। 'যুদ্ধ কর এবং জয়লাভ কর'-এ মৌলিক সামরিক নীতি সামরিক সংগঠনের শৃঙ্খলা ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় নির্দেশ দান, সুসংহত কার্যক্রম গ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে অন্যান্য ঐক্য বজায় রাখতে

Dhaka University Institutional Repository

অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এ সামরিক সাংগঠনিক সুবিধার কারণে সামরিক বাহিনী যদি ক্ষমতা দখলে সংকল্পবদ্ধ হয় তাহলে ঝটিকা বেগে তা সম্পন্ন করতে পারে।

জাতীয় আনুগত্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণ : সামরিক বাহিনী জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাদের আনুগত্য, কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলের প্রতি নয়। তাদের চেতনা ও মূল্যবোধ জাতির আত্মার সঙ্গে জড়িত। একমাত্র সামরিক বাহিনীর চরিত্র জাতীয় চরিত্র যা সমাজের অন্য কোনো সংগঠন দাবি করতে পারে না।

এ সম্পর্কে Liveria salazar-এর অভিমত হচ্ছে, 'For the soldier there exists neither the hamlet, nor the region, nor the province, nor the colony. There is for him nothing but the national territory. He has no family. No relatives no friends, no neighbours only the people who live and work in the national terirtory. He has only in a word the fatherland in all its material expressions, in a totality of its sentiments and traditions in all beauty of its historical evolution and its future idea. To it he must surrender all; safety, peace family and life itself.'

জাতীয় সংকটকালীন পরিস্থিতি : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতীয় সংকট দেখা দিলে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ঘটে। এ সংকটকালীন সরকার এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তারা সংকট মোকাবিলার জন্য সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করে। আর সে সুযোগে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর বলেন, 'রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ হয় প্রথমত সেই দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণে। দ্বিতীয়ত তা সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব সংকটের কারণে।' এ সম্পর্কে আরো বলা হয়, 'When a civilian government is treaeted by national interest, The military feel to take over political power.'

দীর্ঘকালীন সংকট : উন্নয়নশীল দেশগুলোর সংখ্যালঘু শাসক গোষ্ঠী এমনভাবে শাসন করে যে জনগণের মধ্যে ঘৃণা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। তাই জনগণের মধ্যে গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। এ বিক্ষোভ প্রশমনে বেসামরিক সরকার সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনী এভাবে কর্তব্য পালনে ব্যক্তিদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেষ্ট হন এবং সংকট অতিক্রম

Dhaka University Institutional Repository

করার নিজেদের দক্ষতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন। ফলে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে সচেষ্ট হন।

বৈধতার সংকট : তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক সমস্যাবলির মধ্যে অত্যন্ত প্রকট সমস্যা হলো বৈধতার (Legitimacy) সমস্যা। Legitimacy শব্দটি ল্যাটিন ligtimus থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ Lawful বা আইনানুগ। Legitimacy সম্পর্কে S . M. lipset বলেন, 'legitimacy involves the capacity of the systems to engenjder and maintain the belief that existing political institutions are most appropriate for the society.'

আর এ বৈধতার সংকটের কারণে ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে থাকে। যখন একটি দেশের সরকার জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়, আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি হয় তখন সে সরকার বৈধতার সংকটে পড়ে। আর এ সুযোগে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। এ প্রসঙ্গে D. A. Rustaw বলেন, 'The basic reason for military intervention is the lack of a sense of legitimacy of the Government.'

নেতৃত্বের সংকট : উন্নয়নশীল দেশগুলো স্বাধীনতার পর পর Leadership cricis-এ ভোগে। যোগ্য ও শক্তিশালী নেতৃত্ব শূন্যতার সুযোগে সেনাবাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে। যেমন : ১৯৪৯ সালে লিবিয়ায় এবং ১৯৫৩ সালে কলম্বিয়ায় এ কারণে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে।

সুসংগঠিত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অভাব : কোনো দেশে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী রাজনৈতিক দল না থাকায় সেসব দেশে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দেয়, আর এ রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। উদাহরণস্বরূপ : পেরু, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর ও লিবিয়ায় এ অবস্থার কারণে সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে দেখা যায়।

নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি : উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি মূলত সংকীর্ণ। এখানে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নেই। এক ব্যক্তি বহু ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জনগণের ব্যাপক রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটে না। জনগণ

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মোটেই নিয়ন্ত্রণ করে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেসব নীতিনির্ধারিত হয়, সে ক্ষেত্রে জনসাধারণের ভূমিকা খুবই সামান্য। পারস্পরিক আস্থাহীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব, আত্মস্বার্থের মারাত্মক প্রভাব, ক্ষমতা ও ক্ষমতাশীলদের প্রতি দুর্বলতা রাজনৈতিক কৃষ্টিকে ভঙ্গুর করে তুলেছে।

এসবের ফলে রাজনৈতিক সংগঠনে দ্রুত ভাঙন, বিরোধী দল থেকে সরকারি দলে প্রবেশ, একদল থেকে নির্বাচিত হয়ে অন্যদলে যোগদান সচরাচর চোখে পড়ে। এ দুর্বল ও অপরিণত রাজনৈতিক কৃষ্টির কারণে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। কেননা হস্তক্ষেপের সময় তারা জনতার প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় না। এ প্রসঙ্গে S. E. Finer বলেন, 'যে দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি নিম্নমানের সে দেশে সেনাপতিরা রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণে প্ররোচিত হন।'

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব : সংক্ষেপে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলো জনগণের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সুষ্ঠু ও রীতিসিদ্ধ মাধ্যম বা সংগঠনকে বুঝায়। আর রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীরকরণ হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সংগঠন ও সাংগঠনিক রীতি, পদ্ধতি, মূল্যবোধগুলো স্থিতিশীলতা অর্জন করে সমাজ জীবনে এগুলোর উপযোগিতা প্রমাণ করে। একটি দেশে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকে। যেমন : রাজনৈতিক দল, আইন সভা, সংবিধান নির্বাচন ব্যবস্থা ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রভাব ও হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে স্বাধীন ও প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যন্তরীণ মেকানিজমের মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করাই হলো রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়টির ব্যাপক ব্যাখ্যা দান করেছেন এস পি হান্টিংটন।

তিনি রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বলতে বুঝিয়েছেন নৈর্ব্যক্তিক আইন নির্ভর বিধিবিধানের ভিত্তিতে প্রণীত ও নিময়নীতি মোতাবেক পরিচালিত সাংবিধানিক তৎপরতাকে ও এতদসংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে যা নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও স্থিতিশীলতা আনয়নকারী শক্তি হিসেবে কাজ করে। বস্তুত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু বিকাশ না হলে জনগণের দাবি ও আকাঙ্খার একত্রীকরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা জনগণের আকাঙ্খা অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা যাবে না এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও রক্ষা হবে না। Huntington বলেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের মাত্রা অধিক হলেও সে অনুপাতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে সমাজে আইনের ও সংবিধানিক শাসনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠান ও এদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাবে সামরিক বাহিনী সহজে ক্ষমতা দখল করে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রাজনীতির প্রধান চরিত্র। আধুনিককালে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর অধিকাংশ নতুন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও অধিকাংশ দেশে তা ব্যর্থ হয় এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা রাজনৈতিক ব্যবস্থার হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং বিশৃঙ্খলারই নামান্তর। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে দরিদ্রতা, সন্ত্রাস, ক্ষমতার বৈধতার অভাব, অর্থনৈতিক অসাম্য, সৎ কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বৈরতন্ত্রের ঐতিহ্য, গণতন্ত্র সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান, আইন ও সাংবিধানিক শাসনের অভাব, যৌক্তিক ও গতিশীল নেতৃত্বের অভাব, নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সহনশীলতার অভাব, রাজনৈতিক মূল্যবোধের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, জাতীয় সংহতির অভাব ইত্যাদি। আর এ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে সামরিক বাহিনী অভ্যুত্থান ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৩২ সালে স্পেন, ১৯৪২ সালে মিসর, ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান, ১৯৬০ সালে তুরস্ক, ১৯৬৫৬ সালে দাহোমে, ১৯৬৬ সালে নাইজেরিয়ায় যেসব সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিল সেগুলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে হয়েছিল।

বিদেশি শক্তির প্ররোচনা : তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলো অনেক দিক দিয়েই দুর্বল এবং পরিবর্তনশীল। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে তারা বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর পুঁজি প্রযুক্তি ও সামরিক নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বহুক্ষেত্রে নতুন রাষ্ট্রগুলোর বেসামরিক সরকারকে পদচ্যুত করে। যেমন : মোসাদ্দেক (ইরান), আলেন্দে (চিলি) ও সুকর্ণের কথা অনেকেরই জানা। এমনকি পানামার শক্তিশালী মানব বলে পরিচিত নারিয়েগার অভ্যুত্থান ও গ্রেফতারের ব্যাপারে সিআইয়ের জড়িত থাকার অভিযোগ শোনা যায়।

সামরিক জান্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহ : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামরিক হস্তক্ষেপের আরেকটি কারণ হলো সামরিক জান্তাদের ক্ষমতার মোহ। পদোন্নতির

Dhaka University Institutional Repository

আকাঙ্খা, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ, প্রতিহিংসা অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে অনেক সময় সেনাবাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৫৮ সালে ইরাক ও পাকিস্তান, ১৯৬৪ সালে উগান্ডা ও কেনিয়ায়, ১৯৬৬ সালে নাইজেরিয়ায় সামরিক অফিসারদের ক্ষমতার মোহের কারণে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।

জাতীয় ঐক্য সংকট : তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো মূলত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এসব অধিকাংশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এসব দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে নেতিবাচকভাবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একই সঙ্গে এদের জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসত্তা, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এমনি পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে সামরিক বাহিনী সরাসরি হস্তক্ষেপ করে।

সুশীল সমাজের দুর্বলতা : সিভিল সমাজ মানে নাগরিক সমাজ। যে সমাজ সযত্নে নিজেদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে রাখে। সিভিল সোসাইটি প্রকৃতপক্ষে সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের পাহারাদার বা ওয়াচডগ (The civil society is infact a watchdog over the activities of the public functionaries) অর্থাৎ একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর সিভিল সোসাইটি গণতন্ত্রের ৩টি অত্যাবশকীয় উপাদান দায়িত্বশীলতা, অংশগ্রহণ এবং সংস্কারের সার্বক্ষণিক লালন-পালন করে থাকে। (A strong and active civil society may foster the three elements essential for democracy, accountability, participation and continuing momentum for reform.) UNDP-এর মতে, সিভিল সোসাইটি নতুন প্রশাসন পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং প্রধান চালিকাশক্তি। ইউএনডিপি বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ে তাই সুদৃঢ় করতে চায় সিভিল সোসাইটি।

মোট কথা, সিভিল সোসাইটি সুশাসন, আইনের শাসন ও সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠায় অবিরত থাকে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে অনেক সময় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব লক্ষণীয়। সমাজে সংগঠিত শক্তির উপস্থিতি অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে সুশীল সমাজের এ দুর্বলতা সামরিক হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অবনতি : তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের অর্থনীতি যখন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, সরকারি অফিস আদালতে দুর্নীতি ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দুর্নীতির কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের দুর্নীতি, গণঅসন্তোষ, হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। তাছাড়া দলীয় সদস্যদের লাইসেন্স, পারমিট ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এ অবনতির জন্য ক্ষমতাসীন সরকারকে দায়ী করা হয়। এ সময় ভগ্ন অর্থনীতি উদ্ধার কল্পে এবং ব্যাপক দুর্নীতি রোধকল্পে সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান ঘটায় এবং এরা ক্ষমতা দখল করে। ল্যাটিন আমেরিকা বিশেষ করে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও ভেনিজুয়েলায় এবং ১৯৬৩ সালে গুয়েতেমালার এবং জেমিনিয়ান Republic-এ এই পরিস্থিতিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে।

স্বধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ : উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে আর সেখান থেকে তারা প্রেরণা পায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার। কেননা, এ সময় তারা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সংস্থায় অধিষ্ঠিত থাকে এবং বেসামরিক প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা ক্ষমতা দখল করে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখযোগ্য।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি : স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থায় জনমনে তেমন স্বস্তি ফিরে আসেনি। রাজনৈতিক হানাহানি, দলীয় কোন্দল ও গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সরকারবিরোধী তৎপরতা জনজীবনকে বিষিয়ে তোলে। এর ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। গণঅসন্তোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিরোধী দলের ঘন ঘন হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এ সময়ে প্রশাসনযন্ত্র নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণপূর্বক জনগণের মনে স্বস্তি ফিরে আনার অজুহাতে সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায় এবং অভ্যুত্থান ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্রতা/অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা : S. E Finer-এর মতে, সামরিক অভ্যুত্থানের একটি কারণ হচ্ছে- দরিদ্রতা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থানের হার ৭৫% (১৯৫৭-৬৪)।

সেনাবাহিনীর প্রতি অবহেলা ও ব্যক্তিগত বাহিনী গঠন : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষমতাসীন দল নিজেকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তিগত বাহিনী অর্থাৎ সেনাবাহিনীর Paralal বাহিনী গঠন করে। যার ফলে সেনাবাহিনীকে অবহেলা করা হয়। আর এ কারণে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশে রক্ষী বাহিনী গঠন এ কারণে ১৯৭৫ সালে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে।

শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব : নিম্নমাত্রার রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আধুনিক মূল্যবোধের অভাব, শিক্ষার অভাব, চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপুষ্টি, ব্যাধি, আশ্রয়হীনতা ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশগুলোর মৌলিক সমস্যা। উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় অনেক কম। তাছাড়া দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও এটা সত্য যে, এখানে বণ্টন ব্যবস্থা খুবই অসম। ফলে জনগণ তাদের জীবনযাত্রার অধিকাংশ সময় ব্যয় করে অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহের জন্য। তারা রাজনৈতিক চর্চা থেকে অনেক দূরে থাকে। জনগণের এ রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

সামরিক বাহিনীর অস্ত্রেও ওপর একচেটিয়া আধিপত্য : অস্ত্রের আমদানি-রফতানি, অস্ত্রের ওপর সামরিক বাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য এবং উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অস্ত্র রফতানি বা হস্তান্তর সামরিক অভ্যুত্থানের একটি অন্যতম কারণ। অস্ত্র হস্তান্তর উন্নয়নশীল দেশের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী দক্ষ ও আধুনিকীকরণ করে। এ সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। যেমন : ১৯৫৪ সালে আইয়ুব খানের প্ররোচনায় সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ওই চুক্তির অধীনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ৫টি ডিভিশনকে প্রশিক্ষণ ও আধুনিকীকরণ করার জন্য ১৭৫ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র হস্তান্তর করে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান হয়। আরো দেখা যায়, স্নায়ুযুদ্ধের সময় তুরস্কের কৌশলগত গুরুত্ব বেড়ে যায়। যার ফলে তুরস্ক মার্শাল প্লান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তির আওতায় ২ বিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য পায়। এ সাহায্যের ফলে তুরস্কে অনেক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয় ১৯৭৪ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রেরিত ৩০টি ৫৪ রাশিয়ান নির্মিত ট্যাঙ্কের সাহায্যে ইথিওপিয়া ১৯৫৩-১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া থেকে প্রচুর সামরিক অস্ত্র সাহায্য পায়। যার ফলে ইথিওপিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান হয়। ল্যাটিন আমেরিকার কতিপয় দেশ বলিভিয়া, চিলি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কোস্টারিকা ইত্যাদি দেশেও অস্ত্র হস্তান্তরের ফলে সামরিক অভ্যুত্থান হয়। স্যামুয়েল ফাইনারের মতে, 'সামরিক বাহিনীর রয়েছে অস্ত্রের একচেটিয়া ও বল প্রয়োগের পন্থা গ্রহণের ব্যাপারে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। কাজেই আশ্চর্যের বিষয় এটা নয় যে, কেন তারা বিদ্রোহ করে তাদের বেসামরিক প্রভুদের বিরুদ্ধে, বরং কেন তারা সর্বদা মান্য করে।'

দলীয় কোন্দল : কোনো দেশের শাসক দলের অভ্যন্তরে দলাদলি ও কোন্দল অধিক মাত্রায় দেখা দিলে তা সে দেশের রাজনীতিতে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। সরকারের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ সরকারের ওপর অধিক মাত্রায় চাপ প্রয়োগের সুযোগ পায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য ও কোন্দল রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের একটি অন্যতম কারণ।

অধ্যাপক লাস্কির অভিমত : অধ্যাপক লাস্কি উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ সম্পর্কে বলেছেন যে, একটি রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য মুক্তি লাভ করার পর অনেক সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম হলো :

ক. জাতীয় আদর্শের অভাব;

খ. যৌক্তিক আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতি;

গ. গণতন্ত্রের অভাব;

ঘ. ব্যাপক ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রাপ্ত ফলের অভাব।

একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে এ ৪টি জিনিসের অভাব হওয়ার কারণে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়াটি (state building process) যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়াটি যখন বিঘ্নিত হয় তখনই ওই রাষ্ট্রে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, অর্থনৈতিক অবনতি, স্থিতিশীল পরিবেশ নষ্ট, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি এসব ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। সরকার এসব ঘটনা দমন করতে গিয়ে একেবারেই অযোগ্য বলে পরিগণিত হয় এবং ঠিক ওই সময়ই রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করে। সামরিক বাহিনী তখন সরকারকে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ত্রুটিগুলো তারা

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করে। এরই সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, দেশে শিক্ষিত যুবকরা তাদের পছন্দ মাফিক কর্মসংস্থান পায় না। এমতাবস্থায় কিছু কিছু রাজনৈতিক দল যুব সমাজকে তাদের নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে। নাশকতামূলক কাজের মধ্য দিয়ে ওই সব কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সরকার এ ধরনের অস্থিতিশীল পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করে যা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে পরিগণিত হয়। সরকারের এ দুর্বলতার সুযোগে সামরিক বাহিনী তাদের অভিপ্রায় ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

বিপ্লবের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি মনে করে যে, গণতান্ত্রিক সরকারের চেয়ে সামরিক জান্তা উত্তম। যেসব দেশে জনতার বিপ্লব হওয়ার সম্ভাবনা সেখানেই সামরিক জান্তার স্টিম রোলার চলেছে জনগণের ওপর, কারণ সামরিক জান্তা বিপ্লবকে দমন করতে চায় শক্তির মাধ্যমে। এল সালভাদর, গোয়াতেমালা এরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সাম্রাজ্যবাদের সেবক হিসেবে কাজ করে। অর্থের বিনিময়ে এসব দেশের সামরিক অফিসাররা অনেক সময় নিজেদের বিবেক বিকিয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়। চিলিতে আলেঙ্গকে, ঘানায় নক্রমাকে এবং বাংলাদেশে শেখ মুজিবকে সামরিক বাহিনীর একাংশ হত্যা করে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে।[৯]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সহজেই অনুমতি হয় যে, উন্নয়শীল দেশগুলোর রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের মূলে শুধু এসব দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, রাজনীতির দোষত্রুটি ও ব্যর্থতাই কাজ করে না বরং সেই সঙ্গে বহুজাতিক কর্পোরেশন (Multinational Corporations) এর কালোহাত, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রভাব বলয়ের রাজনীতি ও সমভাবে এবং কোনো কোনো সময় নানা প্রক্রিয়ায় বা রূপে অধিক পরিমাণ ক্রিয়াশীল থাকে।

IMF, World Bank, WTO, বিভিন্ন Multinational Corporations-এর পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নানাভাবে উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। World Bank ও IMF উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যে ঋণ সাহায্য দেয় তা শর্তসাপেক্ষ। অনেক সময় তা রাজনৈতিক সংস্কারের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ হয়। এছাড়া বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির অস্ত্রবাজার চালু রাখার জন্য এসব দেশগুলোতে অরাজকতা তৈরি করে রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্যের বাজার নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দালাল বা লবিস্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থাকে। এটা অস্ত্র, ওষুধ, কৃষি পণ্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এ লবিস্ট নেগোশিয়েটর বা কনসালট্যান্টদের কাজ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ওইসব পণ্যের চাহিদা যদি নাও থাকে তাহলে কৃত্রিমভাবে সে চাহিদা তৈরি করা হয়। এ চাহিদা তৈরির জন্য যোগাযোগ সৃষ্টি হয় এ দেশগুলোর সরকারি নেতা, আমলা এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। তারা গবেষণা করে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করে যে, এ জিনিসের খুবই প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী প্রকল্প তৈরি হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কমিশন লাভের বিনিময়ে সে প্রকল্প পাসও হয়। শুরু হয় দুর্নীতি এবং তা দিয়ে ওই বহুজাতিক সংস্থা বিদেশি সাহায্য দেয়। তা দিয়ে ওই পণ্য বা যন্ত্র বা উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি অনুন্নত দেশগুলোতে আমদানি হয়। এছাড়া বাজার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করা, হত্যাকান্ড সহ সার্বিক সামরিক হস্তক্ষেপ সবই হয়ে থাকে।

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় কারা বসবেন, কি তাদের নীতি তা নির্ধারণের জন্য 'মহান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াও' আন্তর্জাতিক প্রভু বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। সে জন্য সরকার তো বটেই শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিরোধী দলগুলোকেও ধরনা দিতে হয় সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কাছে। এমনকি অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে দেশীয় অর্থনীতিবিদরা গলদঘর্মভাবে কাজ করে থাকেন, কিন্তু তারা মূলত তা করেন বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনডিপি, ইউএইচএইড, এশিয়া ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশনের ভাড়া করা অর্থনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে। বহুজাতিক কোম্পানির অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং মার্কিনি বা ইউরোপীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সামরিক কূটনৈতিক কর্মকান্ড পরস্পর সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠভাবে। এজন্য প্রয়োজনে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্র প্রধানের হত্যার অধিকার পর্যন্ত দেয়া হয়। যেটি মার্কিনি সরকার প্রকাশ্য সিআইএকে প্রদান করেছে। কোরিয়ার যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, কিউবার আগ্রাসন, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহুসংখ্যক আঞ্চলিক যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বেরই গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক নেতা হত্যা, সামরিক অভ্যুত্থান ও কাউন্টার ইনসার্জেন্সিতে এ সংস্থার ভূমিকা বরাবরই মুখ্য।

উন্নত পুঁজিবাদী বিশ্বের ট্রান্স ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণই করে না, একই সঙ্গে রাজনৈতিক খবরদারি করার মধ্য দিয়ে তারা তাদের ব্যবসায়িক ভিত্তি আরো

Dhaka University Institutional Repository

সুসংহত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এ প্রচেষ্টাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানিগুলো গুপ্তচর বৃত্তি, নাশকতামূলক কর্মকান্ড এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সরিয়ে দেয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, এসব কাজে তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণও করে। চিলিতে রাষ্ট্রপতি আলেন্দের হত্যার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিসংস্থা 'আইটিটি'। যেটি মার্কিন টেলিযোগাযোগ খাতের অন্যতম ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানি। এছাড়া অ্যাডলফ হিটলার উত্থানের আর্থিক সহায়তা দিয়েছিলেন জেনারেল মটরস। মধ্যপ্রাচ্যের ইরাকে সাদ্দাম বিরোধী যুদ্ধের পেছনে ওইজিএমসহ অন্যান্য সমরাস্ত্র ব্যবসায়ী এবং খনিজ তেলের ব্যবসায়ীদের ভূমিকা পানির মতো স্বচ্ছ। হন্ডুরাসের আরবেন্দের গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে মার্কিন ট্রান্সন্যাশনাল 'ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি'। অনেক পরে কোম্পানির প্রেসিডেন্টের মন্তব্যটি ছিল– 'হন্ডুরাসের মতো ছোট একটা দেশে ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির মতো এত বড় একটি কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব থাকবে না এ আবার কি কথা।'

ব্যাংক ব্যবসায় বিসিসিআইয়ের নাম সবার জানা। এ ব্যাংকটি ৭০টিরও বেশি দেশে গোয়েন্দাগিরিসহ নানা নাশকতামূলক কাজে উৎসাহ জোগানের উৎস হিসেবে কাজ করছে। মাদক ব্যবসায়ীদের অর্থ জোগান, গোপন অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং সিআইএর মদদে নানা নাশকতামূলক কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেছে বিসিসিআই। ইরানকে বাগে এনে নিকারাগুয়ার সরকারকে উৎখাত করতে কন্টাদের অস্ত্রের চালান পাঠানো, পাকিস্তানকে বাগে এনে সামরিক শাসককে ক্ষমতায় বসিয়ে আফগানিস্তানে মুজাহিদদের অস্ত্রশস্ত্র প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতো বিসিসিআইয়ের তৎকালীন কর্মকর্তা মি. উইলিয়াম কেমি। তিনি তার নিয়মিত গোয়েন্দাদের ব্যবহার না করে ব্যবহার করতেন 'Hardy boys operatives.' নামের কতিপয় ব্যক্তি, যারা পাকিস্তানের আইএসআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো।

এভাবে রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে ট্রান্সন্যাশনাল ব্যাংকগুলোর তথা কোম্পানিগুলোর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থগত সম্পর্ক ইত্যাদি ক্রমাগত অস্বচ্ছ হয়। তৈরি হয় এক ধরনের স্বার্থচক্র (chain of Interest) যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়। [১০]

Dhaka University Institutional Repository

মূলত পুঁজিবাদী বিশ্ব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অদৃশ্য এক সুতার টানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এসব দেশগুলোতে আসামাজিক, রাজনৈতিক দুর্বলতা, সীমহীন দুর্নীতি এবং মারাত্মক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারণেই কেবল সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে না পাশাপাশি এতে মুখ্য ভূমিকা রাখে সাম্রাজ্যবাদের কালোহাত।[১১]

সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের উপরোক্ত কারণ সম্পর্কিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বা পশ্চাৎপদ দেশে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সমস্যা ও সংকট, জনগণের অশিক্ষা-কুসংস্কার ইত্যাদি পশ্চাৎপদতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে সামরিক বাহিনীই একমাত্র সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত পেশাদার নিয়মিত বাহিনী। তারা আধুনিকীকৃত ও উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সুতরাং তাদের এ দক্ষতা, যোগ্যতা-শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ ও আধুনিকীকরণকে জাতির স্বার্থে অর্থনৈতিক সামাজিক অগ্রগতির প্রয়োজনে ব্যবহার করা দরকার মনে করে তারা রাজনৈতিতে হস্তক্ষেপ করে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো খুবই দুর্বল। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও ক্ষেত্র থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বৈরী অবস্থানে আসীন রাজনৈতিক দল, কর্মী ও নেতারা। এসব দেশে নেতারা গণবিচ্ছিন্ন ও কেবলই গোত্র ও ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত থাকায়, অক্ষম ও অদক্ষ হওয়ায়, বিশৃঙ্খল ও সীমাহীন দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকায় সামগ্রিক অর্থে দেশ জাতি জনগণ হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। ফলে উৎপাদনে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। সার্বিক দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী, জীবনযাত্রা দুর্বিষহ এবং রাজনীতিতে মারাত্মক অস্থিতিশীলতা হয় নিত্য সহচর। অতএব সামরিক বাহিনী আর্থসামজিক জীবনে শৃঙ্খলা আনয়নে, দুর্নীতি, অব্যবস্থার দমন এবং সার্বিক স্থিতিশীলতা আনয়নসহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে ক্ষমতা দখল করে।[১২]

পাদটীকা

১. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৮।

২. ড. আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমাজ ও রাজনীতি। রমেল লাইব্রেরি-১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৫৪।

৩. ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, মিলিটারি উইথড্রয়াল ফ্রম পলিটিক্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪। Morris Janowitz, The military in the political A new Nation: P: 32.

৫. ড. আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫।

৬. S. E. Finer, The man on horse back. The Role of the military in politcs, London, 1962. P. 7-20 , S. P. Huntington- The soldier and the state, P-22, Morris Janowits, The military in the political Development of New nations, Chicago, 1964, P-32. Amos Perlmutter, The comparative analysis of military regime, P: 96. J. Wheeler, Bennett, The Nemesis of Power . P: 108-9. Talukder Moniruzzama, Military withdrawal from Politics. P. B-P.3-17.

৭. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেসন্স, ঢাকা-২০০১ পৃষ্ঠা-৯।

৮. Dr. Talukder Maniruzzaman, Military Withdrawal form politics. A Comparative Study. USA 187, P-1. S. E. Finer The man on Horse back, The role of the Military in Politics, London -1962. P.20, 83, 84, 86. Morris janowits, The military in the political development: A new nation. Chicago-1964, P-29. John Jonson (ed). The Role of military in Underdevelopment countries, Princeton-1962. P-5. Amos Perl mutter, The comparative analysis of military reigns. P-36. D. A Rustaw. A world of nations. P-9. Prof. Mayron weiner, Party Building in a new nation. S. P. Huntingtion, Political order in changing societies. P-76.

৯. মো. আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৬, পৃষ্ঠা-৩০-৪৮।

১০. অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, গ্যাট থেকে ডবিরউ টি ও, ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৫।

১১. ড. আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সামাজ ও রাজনীতি, রয়েল লাইব্রেরি, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, নিউ এজ পাবলিকেসন্স, ঢাকা-২০০১, পৃষ্ঠ-৩৩৮।

১. খ. বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি নবীন ও উন্নয়নশীল দেশ। তবে এর ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বেশ কৌশলগত। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব সর্বাধিক। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি সুদৃঢ় সামরিক বাহিনী গঠন করার প্রয়াশ চালানো হয়। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকেই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে গণ্য করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর হতে আজ অবধি সুষ্ঠু, শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্রের বিকাশ সেভাবে সম্ভব হয়নি। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী পাকিস্তান আমলের ক্ষমতালিপ্সু সামরিক বাহিনীরই উত্তরাধিকারী। বাংলাদেশের সিভিল প্রশাসনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখল করার জন্য সামরিক বাহিনী বারবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে ও স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরে এ দেশে বহুবার সামরিক শাসন এসেছে, আবার কখনো বেসামরিক পোশাকে সামরিক শাসনের অবির্ভাব ঘটেছে।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রবাহ।

প্রথম. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। দ্বিতীয়. ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরে। তৃতীয়. ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে। চতুর্থ. ১৯৮১ সালের ৩০ মে। পঞ্চম. ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ।[১]

বাংলাদেশে সামরিক শাসনের জন্ম হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এটা ছিল প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান, পাকিস্তান শাসনামলে ২৩ বছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছিল। পাকিস্তানি শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশে ও স্বাধীনতার পর বিগত বছরগুলোর অধিকাংশ সময় রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেছে সামরিক বাহিনী।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রথম যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সার্বিক বিবেচনায় একে গতানুগতিক সামরিক অভ্যুত্থান বলা যাবে না। কারণ এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগতভাবে সামরিক বাহিনীর কোনো সংশ্রব ছিল না। এটা ছিল সামরিক বাহিনীতে

Dhaka University Institutional Repository

চাকরিরত এবং বিভিন্ন অভিযোগে চাকরিচ্যুত জুনিয়র অফিসারদের আনুমানিক ১ হাজার ৫০০ সদস্যের ক্রোধ এবং দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফল। এর নির্মম শিকার স্বাধীন বাঙালি জাতির জনক ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার পরিবারের উপস্থিত সব সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট্য ভূমিকা পালনকারী আরো অনেকে। ওই অফিসারদের হাতে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী ৪ জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহম্মদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জান। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করে। দেশের সংবিধান বাতিল করা না হলেও সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং সে অনুযায়ী দেশ চলতে থাকে।

১৫ আগস্ট ক্ষমতা দখল করে খন্দকার মোশতাক আহমদকে কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে সম্মুখে রাখা হলেও মূল ক্ষমতা ছিল তরুণ সামরিক অফিসারদের হাতে। এ নিয়ে অতি দ্রুত সামরিক বাহিনীতে অসন্তোষ দেখা দেয়। সামরিক বাহিনীতে শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকান্ডে যুক্ত অনেককে বিদেশে যেতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু খালেদ মোশাররফ মাত্র ৪ দিন ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হন। ৭ নভেম্বর এক পাল্টা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন। সামরিক বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তার সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ এনে প্রথমেই জিয়া বঙ্গবীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টরে কমান্ডার কর্নেল আবু তাহের বীর উত্তমকে ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা করেন।[২]

উল্লেখ্য, কর্নেল তাহের ও সামরিক বাহিনীতে তার অনুসারীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। জেনারেল জিয়া ক্ষমতাসীন থাকাকালীন ১৯৭৫-১৯৮১ অন্তত ২০ বার তার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ। এর সঙ্গে যুক্ত থাকার কথিত অভিযোগে অনেককে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। ৫ বছরের মতো দেশে শাসনের পর ১৯৮১ সালের ৩০ মে জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্রগ্রামে এক ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন। এরপর ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট পদে

Dhaka University Institutional Repository

অধিষ্ঠিত হয়ে কিছুকাল দেশ পরিচালনা করেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক আইন জারি করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সাত্তার সরকারকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করেন।[৩]

এভাবেই বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী বারবার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং জেনারেল এরশাদ তার শাসনকাল দীর্ঘ ৯ বছর টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন।

মূলত বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত চলেছে সামরিক শাসন। বাংলাদেশের সামরিক শাসনের পর্যবেক্ষণে এর কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি–

১. পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে ক্ষমতায় আসে। জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল এরশাদ ২ জনেই ক্ষমতা দখলের জন্য অন্য সামরিক নেতাদের মতো অভ্যুত্থানের যুক্তি দাঁড় করালেন। সামাজিক, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, নজিরবিহীন দুর্নীতি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, প্রশাসনিক অচলাবস্থা, আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, খাদ্য সংকট জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি দারুণ হুমকির হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্যই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা নিয়েছে।[৪]

২. জেনারেল জিয়া এবং জেনারেল এরশাদ উভয়েই ক্ষমতায় এসে সামরিক ফরমান জারির মাধ্যমে সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করেন, এক হিসাবে দেখা যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯-এর সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক আহমদ, বিচারপতি আবু সাদত মো. সায়েম এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান মোট ২৩টি ফরমান বা অধ্যাদেশ জারি করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এগুলো বৈধ এবং সংবিধানের অংশ করে নিয়েছে।[৫]

৩. সামরিক শাসনের অন্যতম আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাপক হারে বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এক হিসাবে দেখা যায় যে, ৩৬টি সরকারি কর্পোরেশনের ১৭টিতে চেয়ারম্যান এবং ১২টিতে মহাপরিচালক পদে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা কর্মরত ছিল। ৬৪টি জেলার ৫৩টিতে পুলিশ সুপার নিযুক্ত হয়েছেন সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। তাছাড়া সে সময়ের সিভিল সার্ভিসের শতকরা ১০ ভাগ এবং সামরিক বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। (উৎস সমাজ নিরীক্ষণ ২৮ পৃষ্ঠা-৩১)। আবার আরেকটি হিসাবে দেখা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রশাসনের উচ্চ পদে ১০ সামরিক কর্মকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। সেক্টর কর্পোরেশনে এদের সংখ্যা ছিল ৭৫ জন, এদের উচ্চ পদে নিয়োগদান করা হয়। এ সময় পর্যন্ত রাষ্ট্রদূত হিসেবে সামরিক কর্মকতার সংখ্যা ১৩ জন। কাউন্সিলর পদমর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন ১৫ জন।

৪. বাংলাদেশের সামরিক শাসনের আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হত্যা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি করা। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড ছাড়াও নভেম্বরে জেলে ৪ নেতার হত্যাকান্ড, ১৯৮১-এর হত্যাকান্ড প্রভৃতি এর উদাহরণ। এছাড়া এরশাদের সময়ে কমপক্ষে ২৫০ রাজনৈতিক নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন।

৫. বাংলাদেশের সামরিক শাসকরা তাদের সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণ ও বৈধকরণের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নেন। যেমন- জিয়ার শাসনামলে ১৯৭৭-এর হ্যাঁ-না ভোট, ১৯৭৮-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, ১৯৭৯-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন, সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির সংশোধন ইত্যাদি পদক্ষেপের কথা বলা যায়।[৬]

একইভাবে এরশাদের ১৯৮৫-এর গণভোট, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮-এর সংসদ নির্বাচন এবং ১৯৮৬-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নিজেদের সামরিক জান্তা থেকে বেসামরিক নেতায় রূপান্তরের পথ অবলম্বন করেন।

৬. বাংলাদেশের ২টি সামরিক সরকারই রাজনৈতিক দল গঠনের মাধ্যমে রাজনীতিতে স্থায়ী আসন নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যেমন : জিয়াউর রহমান জাগদল, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন।[৭] অন্যদিকে এরশাদ গঠন করলেন ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ জনদল, জাতীয় ফ্রন্ট থেকে জাতীয় পার্টি।

৭. বাংলাদেশের ২টি সামরিক সরকারই ক্ষমতা দখল করে প্রচার মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তাছাড়া সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে সব রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এভাবে জনগণের বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে সামরিক সরকার।

৮. বাংলাদেশে সামরিক শাসনকালে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে, অনেকাংশে সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি।

৯. তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সামরিক শাসন আগমনের পেছনে সাম্রাজবাদী/নব্য উপনিবেশবাদী অথবা বিশ্ব পুঁজিবাদের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তায় ১৯৭৫ সালে সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আসে। একইভাবে এরশাদের ক্ষমতায় আসার পেছনেও দেশটির হাত ছিল।

১০. রাজনীতি সম্পৃক্ততা ও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্বের বদলে সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্ম দেয়। এতে এ প্রতিষ্ঠানটির উচ্চ পর্যায়ের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত রেষারেষি ও স্বার্থের রশি টানাটানি এবং উপদলীয় কোন্দলের সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে সামরিক আমলতান্ত্রিক স্বৈরশাসন তৈরি করেছে সামরিক বিপর্যয়, যার মধ্যে আছে বিকৃত রাজনীতি, সমস্যাগ্রস্ত অর্থনীতি, সহিংসতা, দুর্নীতি ও সামাজিক অসাম্য। ২টি সামরিক শাসনই বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।[৮]

১. গ. বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশগুলোতে সেসব কারণে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে বাংলাদেশের বেলায় তার ব্যতিক্রম নেই বলা যায়, তথাপি গতানুগতিক কারণগুলোর পাশাপাশি কিছু নির্দিষ্ট কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে। যেমন :-

রাজনৈতিক ক্ষমতা সচেতনতা : ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সদস্যদের অনেকে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

এর ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা সচেতনতা ও উচ্চাকাঙ্খা সৃষ্টি হয়। যা পরবর্তী সময়ে তাদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে প্রলুব্ধ করে।

চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীভুক্ত বাঙালি সৈনিকদের অনেকে চেইন অব কমান্ড ভেঙে বিদ্রোহ করে এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। এতে করে এক ধরনের নজির ও মানসিকতার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তী সময়ে তাদের আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে। মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর মুখ্য ভূমিকা স্বাভাবিকভাবে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলে।

প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যের অভাব : বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে মুক্তিযোদ্ধা, অমুক্তিযোদ্ধার, পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাসদস্য, রক্ষীবাহিনী এরূপ অভ্যন্তরীণ

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্তি ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল। এ অবস্থা সামরিক হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করে। মূলত স্বাধীনতার পর সামরিক বাহিনীর প্রত্যাশা পূরণে সরকার ব্যর্থ হলে এবং সামরিক বাহিনীর বিকল্প হিসেবে রক্ষীবাহিনী গঠন করলে সেনা অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়ে।[৯]

যার কারণে পরবর্তীতে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে রাজনীতিতে।

মুক্তিযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ : বাংলাদেশের পুনর্গঠনে মুক্তিযুদ্ধ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। সরকারকে শূন্য অবস্থা থেকে দেশের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অর্থনীতি গড়ে তুলতে হয়। চারদিকে ছড়িয়ে ছিল অবৈধ অস্ত্র, তথাকথিত বিপ্লবের নামে বামপন্থী বলে পরিচিত কতিপয় সংগঠন সরকার উৎখাতে সক্রিয় হয়। দেশজুড়ে চলতে থাকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ও নাশকতামূলক তৎপরতা। উদ্ভূত পরিস্থিতি শুধু অগণতান্ত্রিক বা অশুভ শক্তির জন্যই অনুকূল ছিল। এর মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বলতে কিছুই ছিল না । আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিনের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সংকটের বিস্তৃতি এতই ব্যাপক ছিল যে তা সামলানো এ দলের পক্ষে প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে।

ষড়যন্ত্র : মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দেশি-বিদেশি শক্তি সরকার উৎখাতে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয় এবং সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যর ওপর ভর করে এতে সফলকাম হয়।

স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাজনীতিতে যখন প্রথম সামরিক হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয়। তখন ২ পরাশক্তির মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ যে এর শিকার তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।[১০]

রাজনৈতিক সংকট, নেতৃত্বের কোন্দল, আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও খাদ্যাভাবজনিত কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সুযোগে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে বাংলাদেশে। ফলে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিতে দরিদ্রপীড়িত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করার চক্রান্ত শুরু হয়। যার চূড়ান্ত রূপ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান।

অবশ্য সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রথম দিককার সামরিক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণগুলো দায়ী থাকলেও পরবর্তীতে যেসব কারণ ছিল, তার সদৃশ্য এর সঙ্গে থাকলেও আরো নতুন সব কারণ যোগ হয়েছিল যেমন :

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্য নেতৃত্বের অভাব : শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর যে নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব পায় তা অনেকটাই দুর্বল ছিল। যার ফলে সামরিক বাহিনী নেতৃত্ব নিতে আগ্রহী হয়ে উঠে।

দুর্নীতি : এরশাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর বেশ দৃঢ়ভাবেই দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর ওপর। যদিও পরবর্তীতে এরশাদ তার শাসনামলে দুর্নীতি মহামারী আকারে ছড়াতে থাকে। এমনকি এরশাদ বিরোধী দলগুলোকেও দুর্নীতিতে জড়িয়ে ফেলেন। প্রথমবারের মতো দুর্নীতি ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের অনেকের মধ্যে ভাইরাস হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক অরাজকতা, অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলতা শুধু সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলে উৎসাহী করে তা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণও সামরিক বাহিনীর আগমনের প্রতীক্ষা করে এবং স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা প্রতীয়মান সত্য নিঃসন্দেহে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা দখলের লড়াই এত তীব্রতা পায় যে সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার অন্য কোনো উপায় দৃশ্যমান ছিল না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার লড়াই বড় বেশি স্থূলভাবে প্রতিষ্ঠিত জনসাধারণের কাছে।

পরাশক্তি অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব ও তাদের সমর্থনে যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর পরোক্ষ হস্তক্ষেপও এ ক্ষেত্রে দায়ী। এরূপ বিবিধ কারণে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে।

পাদটীকা

১. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২, পৃষ্ঠা-৪০-৪১।

২. মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীর বিক্রম, একজন জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-১০৮, Talukdar Muniruzzaman, The Bangladesh Revolution and its aftermath, University Press Ltd. Dhaka-1988. P-186-188,203-234.

Dhaka University Institutional Repository

৩. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ : রাজনীতি ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪০-৩৪১, Emajuddin Ahamed, Military Rule the Myth of Democracy, University Press Ltd. Dhaka, 1988, P-131.

৪. এমাজউদ্দিন আহম্মদ, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংকট, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৫৬।

৫. হাসানুজ্জামান, "বাংলাদেশে সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া এবং জিয়া শাসন, মুস্তফা মজিদ (সম্পা.), রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৫৯।

৬. Rounq Jahan, Bangladesh Politics: Problems and Issues, University Press Ltd. Bangladesh 1980. P-205-207, 211.

৭. প্রাগুক্ত।

৮. মো. আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা-২০০৬, পৃষ্ঠা, ২০৮-২১১।

৯. M. Nazrul Islam, æParliamentary Democracy in Bangladesh An Assessment," Perspectives in Social Science, Vol. 5, University of Dhaka, October 1998, P-56-57.

১০. ড. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪১-৩৪২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. ক. ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ও এরশাদের ক্ষমতা দখল বিশ্লেষণ এবং সামরিক শাসন জারির কারণ :

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত বিএনপি সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে রাষ্ট্রের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। ভেঙে দেয়া হয় জাতীয় সংসদ। সংবিধান স্থগিত করা হয়। রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে এরশাদ নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং অপর ২ বাহিনীর প্রধানরা উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার দৃশ্যত এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান।[১]

বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার দেশ পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হন। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেশ এক সংকটজনক অবস্থায় উপনীত হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে।[২]

৪ মাসের ব্যবধানে ২ বার মন্ত্রিসভা রদবদল করতে হয়। অন্যদিকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একের পর এক চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে সাত্তার সেনাবাহিনী অনুকূলে ১৯৮২ সালে ২৪ মার্চ ক্ষমতা ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যম ক্ষমতা দখলের পটভূমি ও কৌশল :

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করে দেশে সামরিক আইন জারি করেন। এ সামরিক শাসন জে. এরশাদ হঠাৎ করেই জারি করেননি বা সামরিক শাসনের যে প্রেক্ষাপট তা ২-১ মাস ষড়যন্ত্র করে তৈরি করেননি। এজন্য জে. এরশাদকে দীর্ঘ সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, তার ষড়যন্ত্রের প্রক্রিয়া প্রায় অর্ধযুগের। অর্ধযুগ ধরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে খুব সুক্ষ্মভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে একের পর এক পথের প্রতিবন্ধক বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দিয়ে সুকৌশলে তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। করতে হয়েছে বিভিন্ন নাটকের অবতারণা।

১৯৭৪ সালে লে. কর্নেল হিসেবে এরশাদ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তার কার্যকলাপে তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার ওপর যথেষ্ট ক্ষিপ্ত ছিলেন। শেখ মুজিব এরশাদকে অব্যাহতি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন সেনাবাহিনী থেকে। এমতাবস্থায় এরশাদের মামা রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ভোলামিয়ার তদবিরে আওয়ামী লীগ সরকার এরশাদকে পূর্ণ কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে এবং ভারতে থাকাকালীন তিনি দূরদর্শিতার সাহায্যে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হন।[৩]

৭৫-এর ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন এবং ৭৫-এর ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পাদপ্রদীপে চলে আসেন তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান। সুতরাং এরশাদ সময়ের সদ্ব্যবহার করতে ভুল করেননি। তিনি জিয়াউর রহমানকে ভুলিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং সিনিয়রিটির দোহাই দিয়ে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত এবং নিখুঁত সব চাল চেলে পর্যায়ক্রমে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরে জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। মেজর জেনারেল মীর শওকত আলীকে নবম পদাতিক ডিভিশন থেকে ৫৫ পদাতিক ডিভিশন করা হয়। মঞ্জুর এবং শওকতের সম্পর্কেরও দারুণ অবনতি ঘটে। ঢাকাসহ ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডকে সরাসরি সেনাবাহিনীর সদর দফতরের অধীনে ন্যস্ত করাকে কেন্দ্র করে। তৎকালীন চিফ অব জেনারেল স্টাফ মঞ্জুরের এ পদক্ষেপের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে মেজর জেনারেল শওকত অবিশ্বাস এবং হুমকি দেখতে পান। ধূর্ত এরশাদ জিয়াউর রহমানকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, এ ২ জনই উচ্চাভিলাষী। সুতরাং ২ জনকেই ঢাকার বাইরে বদলির ব্যাপারে পরামর্শ দেন। জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান এরশাদের কথা বিশ্বাস করেন এবং এ ব্যাপারে জিয়ার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনা অফিসার ও পিএস মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল নুরুল ইসলাম এরশাদকে সমর্থন জানালেন। জেনারেল জিয়া উপরোক্ত পদক্ষেপ নিতে সম্মত হন।[৪]

মঞ্জুর চিফ অব জেনারেল স্টাফ থাকাকালীন একটি বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করতেন। চট্টগ্রামে বদলি হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনঃক্ষুণ্ন হন। শওকত ও মঞ্জুরের উচ্চাভিলাষের কাহিনী বর্ণনা করে জিয়ার কানভারী করে তোলার ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিলেন এরশাদ। এর ফলে মঞ্জুর ও জিয়াউর রহমানের মধ্যকার এত দিনের আন্তরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এমনকি এরশাদকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগের পর মঞ্জু এতই ক্ষিপ্ত হন যে জিয়াকে তার মনোভাব জানাতে দ্বিধাবোধ করেননি। এরশাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে মঞ্জুর জিয়াউর রহমানকে অবহিত করেন যে, সেনাবাহিনী প্রধান একজন দুর্নীতিবাজ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তি।[৫]

তবে বিশ্বস্ততা অর্জনে মঞ্জুর চেয়ে বেশি সফলকাম হয়েছিলেন এরশাদ। পরবর্তীকালে শওকতকে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ড থেকে সিইনসি এর সচিবালয়ের পিএসও হিসেবে পদস্থ করা হয়। কারণ এরশাদ জিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, মঞ্জুর ও শওকত ২ জনই যদি ডিভিশনের কমান্ডে থাকে তাহলে তারা অভ্যুত্থান করে ফেলতে পারেন। এভাবে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও শওকতের বিবদমান সম্পর্ক এবং মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তান প্রত্যাগত বিভাজনকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন এরশাদ। পদাধিকার বলে জিয়া এরশাদকে অমুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব দেন। আর এ বাহ্যিক ছদ্মবেশের রূপ ধরে জিয়ার সঙ্গে এ ২ মুক্তিযোদ্ধা জেনারেলদ্বয়ের সম্পর্কের অবনতির সুযোগ নেন এরশাদ।

ইতিমধ্যে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দল বিএনপিতে কোন্দল দেখা দেয়। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ওই সংকট নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য চট্টগ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে চট্টগ্রামে গমন করেন।[৬]

উল্লেখ্য, এরশাদ মঞ্জুরের সঙ্গে গোপন আলোচনার জন্য জিয়া হত্যার মাত্র ৪ দিন আগে ১৯৮১ সালে ২৬ মে এক অঘোষিত সফরে চট্টগ্রামে যান। সেনাবাহিনীর সদর দফতর থেকে জানানো

Dhaka University Institutional Repository

হয়, এরশাদ বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি পরিদর্শনে যাচ্ছেন। কিন্তু জানা যায়, এরশাদ চট্টগ্রাম পৌঁছেই মঞ্জুরের অফিস কক্ষে ঢুকেন এবং দুপুর ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরামহীন আলাপ করেন। তিনি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি পরিদর্শন না করে সারাদিন মঞ্জুরের সঙ্গে এত কি আলোচনা করেছিলেন তা আজো রহস্যাবৃত। বিকাল ৫টায় এরশাদ মঞ্জুরের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে পতেঙ্গা বিমানবন্দরের দিকে যাত্রা শুরু করেন। মঞ্জুর এরশাদকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে ঘৃণার চোখে দেখতেন বলে কোনো সময়ই এরশাদকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা বা বিদায় জানাতে যাননি। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, মঞ্জুর এবারই প্রথম এরশাদকে বিদায় জানাতে একই স্টাফ কারে বসে বিমানবন্দরে গেলেন।

২৯ মে (১৯৮১) জিয়া তার দলের ২ বিবদমান গ্রুপের সংকট নিরসনের উদ্দেশে পূর্ব নির্ধারিত রাজশাহী যাত্রা বাতিল করে চট্টগ্রামে যান। উল্লেখ্য, জেনারেল এরশাদের ও প্রেসিডেন্ট জিয়ার সহযোগী হওয়ার কথা ছিল। বস্তুত এরশাদের জন্য জিয়া বিমানবন্দরে প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষা করেন। পরে এরশাদ বিনীতভাবে ফোনে রাষ্ট্রপতিকে জানান, তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়েছেন, তাই তিনি আগামীকাল সকালে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিলিত হবেন। জানা যায়, জিয়া যখন বিমানে চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন তখন এরশাদ মঞ্জুরকে জানান, মঞ্জুর বিমানবন্দরে জিয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে যান এটা রাষ্ট্রপতি চান না। নানা ক্ষোভে বেসামাল মঞ্জুর ভয়ানক ক্ষুব্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের সঙ্গে কথা বলেন। সামরিক সচিব বলেন, রাষ্ট্রপতি যখন চান না তখন তার বিমানবন্দরে না যাওয়াই উচিত। মঞ্জুর এতে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। এরশাদ কৌশলে এ ধরনের একটি মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন এবং জিয়া ও মঞ্জুরকে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সংঘাতের মুখে ঠেলে দিলেন। আর এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জিয়া ২৯ মে ১৯৮১ চট্টগ্রাম সফরে গিয়ে সার্কিট হাউসে অবস্থানকালে ৩০ মে ১৯৮১ কাকডাকা ভোরে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী কিছু সৈন্যের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।[৭]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের প্রতি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানরা আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং রাষ্ট্রপতি সাত্তার ও ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ পূর্ণ সহযোগিতা করেন।[৮]

যদিও সামরিক এলিটরা অনেকে জেনারেল জিয়ায় প্রতি তার শাসনামলের শেষের দিকে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবুও তারা তাকে নিজেদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সামরিক ব্যক্তি মনে

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। বিচারপতি সাত্তারের বেলায় তাদের সেরূপ বিশ্বাস ছিল না। তবুও তারা নেপথ্যে বিচারপতি সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাহায্য করেন।[৯]

কারণ বিএনপির বিকল্প আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি সামরিক বাহিনীর অনুকূলে ছিল না। সামরিক এলিটরা হয়তো ভেবেছিল যে, তার অধীনে তাদের স্বার্থরক্ষা করা সহজতর হবে।[১০]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর পরই এরশাদ সামরিক আইন জারি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছু সামরিক অফিসার এবং বিমানবাহিনী প্রধান সদরুদ্দীনের বিরোধিতার কারণে এরশাদ তা করেননি বা বিলম্ব করেন।[১১]

ক্ষমতা দখলের জন্য এরশাদের এ প্রচেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ জানতেন না। বরং তারা জানালেন জিয়া হত্যার পর এরশাদ ক্ষমতা দখল করতে পারতেন, কিন্তু করেননি বরং সাত্তার সরকারকে কাজে সহায়তা করছেন। শুধু তাই নয়, এরশাদ যে আইনশৃঙ্খলা এবং জিয়াউর রহমানের ভক্ত তা প্রমাণের জন্য জিয়াউর রহমানের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করলেন এবং জিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত করে বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ফাঁসি দিলেন। অন্যদিকে জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নীকে ক্যান্টনমেন্টের দামি জায়গায় বাড়ির মালিকানা দেয়া হলো। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে সেনাবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলো, যে কারণে সিভিল সমাজে সেনাবাহিনী পরিচিত হয়ে উঠলো 'লিমিটেড কোম্পানি' নামে। সেনাবাহিনীতে এরশাদ হয়ে উঠলেন সর্বেসর্বা।[১২]

আর সব কিছুর নেপথ্যে চলতে লাগলো ক্ষমতালোভী এরশাদের সামরিক আইন জারির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ, ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রথমেই তিনি ২টি কাজ সম্পন্ন করলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সাহায্য। প্রথমেই সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করলেন। ১৯৮১ সালের ১১ নভেম্বর এক সঙ্গে ১৯ জন মেধাবী অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হলো। এরপর হুমকি দিয়ে শতাধিক অফিসারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলো। আর এভাবে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি সেনাবাহিনী পাকিস্তান প্রত্যাগতদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেল। দ্বিতীয়ত. সেনাবাহিনী অফিসার ও সৈনিকদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সুপারিশ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন লাভ করলো।

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর বিচারপতি সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ২৭ নভেম্বর তিনি ৪২ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। আর ২৯ নভেম্বর সেনাবাহিনীর সব নিয়মনীতি ভঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

করে এরশাদ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে একটি সংবাদ সম্মেলন করলেন। সাংবাদিকদের সামনে এরশাদ বিস্তারিতভাবে তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে তিনি 'একজন সৈনিক, রাজনীতিবিদ নন এবং তার কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ নেই... সামরিক লোকজন রাজনীতিতে সামরিক অ্যাডভেঞ্চার কামনা করে না। কিংবা সশস্ত্র বাহিনীতে তারা রাজনৈতিক অ্যাডভেঞ্চার চায় না। তারা কেবল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় জনগণকে সাহায্য করতে এবং যে কোনো ভবিষ্যৎ অভ্যুত্থান অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়।[১৩]

অথচ এর ৫ মাস পূর্বে জেনারেল এরশাদ এক সাক্ষাৎকারে যা বলেছিলেন, নভেম্বরের বক্তব্য ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষাৎকারে তিনি উল্লেখ করেছিলেন :-

১. '৩০ মে-এর ঘটাবলিতে দেশকে যে দুর্যোগের পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছিল তাতে নিয়মতান্ত্রিক সরকার নির্দেশিত ভূমিকা পালনে সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি সেনাবাহিনীর প্রধানরূপে পরিতৃপ্ত সন্দেহ নেই...।

২. 'সেনাবাহিনীর কখনো রাষ্ট্র ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া উচিত নয়...।'

৩. 'একজন সচেতন নাগরিকরূপে সেনাবাহিনীর সদস্যর রাজনীতিতে সচেতনতা বাঞ্ছনীয় কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা নয়।'

৪. 'সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষা ও দেশের নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি অনুগত থাকাই আমি প্রতিটি সৈনিকের কর্তব্য বলে মনে করি...।'

৫. সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে, সেনাবাহিনী রাজনীতিতে মাথা ঘামাবে না। আমি মনে করি সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় আসার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটা উচিত নয়...।[১৪]

উল্লেখ্য, মাত্র ৫ মাসের মাথায় এরশাদ তার বক্তব্য পাল্টে ফেলেছিলেন। এরশাদের উচ্চাকাঙ্খা শাণিত ছিল তার ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকেই। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের আবরণে ঢেকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারিতে Bangladesh Army Journal পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে জেনারেল এরশাদ বলেন, 'আমার সুস্পষ্ট দাবি, জাতীয় বাহিনী হিসেবে জাতির সমষ্টিগত উদ্যোগে সামরিক বাহিনীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা উচিত।'[১৫]

জে. এরশাদ সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা যুদ্ধে ও জাতি গঠনে সামরিক বাহিনীর অবদান উল্লেখপূর্বক রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাদের অংশগ্রহণের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করেন। ১৯৮১ সালের আগস্ট মাসে Peter Nies wand'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জে. এরশাদ দৃঢ়ভাবে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

'The army should be directly associated with the governance of the country which might fulfill the ambitions of the army and might not lead to further coups.'[১৬]

১৯৮১ সালের নভেম্বরে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে এরশাদ বলেন, 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংরক্ষরণের জন্য সামরিক বাহিনীকে শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান অনুমোদিত একটা ভূমিকা দিতে হবে।[১৭]

রাষ্ট্রপতি সাত্তার চাপের মুখে সেনা প্রধানের দাবি মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। জে. এরশাদ যুক্তি উপস্থাপন করেন সরকার পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ জরুরি এ কারণে যে, তাহলে সৈনিকরা দেশ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে এবং ফলস্বরূপ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চাইবে না।[১৮]

এমন সময় অবসরপ্রাপ্ত জে. মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানি জে. এরশাদের সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায় অংশগ্রহণের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি প্রদান করলে অপর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল খাজা ওয়াসি উদ্দিন এরশাদের যুক্তি সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু প্রায় সব রাজনৈতিক দল এরশাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এ নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সে সময় সিভিল সমাজের পক্ষে বক্তব্য নিয়ে একমাত্র উপস্থিত হন শেখ হাসিনা ও সুপ্রিমকোর্টের ১৫৫ অ্যাডভোকেট। তারা বিবৃতিতে বলেন, 'সরকার অথবা সেনাবাহিনীর কোনো ব্যক্তির জাতীয় নীতিনির্ধারণের ওপর কোনো বিবৃতি প্রদান অথবা সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানের এখতিয়ার নেই।' বিবিসির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে আজ অবধি ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই সেনাবাহিনীর এখন তাই ক্ষমতা ভাগাভাগির দাবি খুবই স্বাভাবিক। রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর প্রবেশ কোনো গণতান্ত্রিক দেশের জন্যই কাম্য নয়, হতে পারে না।[১৯]

এমতাবস্থায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি বলেন, 'দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ছাড়া সামরিক বাহিনীর অন্য কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। এতেও এরশাদ নিরস্ত হননি। বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতির ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য জাতীয় পত্র-পত্রিকায় বিশেষ করে অবজারভার এবং হলিডেকে বলেন, 'আমাদের অত্যন্ত উঁচুমানের সেনাবাহিনীকে দেশ রক্ষা ছাড়াও উৎপাদনমুখী ও জাতিগঠনমূলক কার্যক্রমে ব্যবহার করা যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে।'[২০] শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা সম্পর্কে এরশাদের বক্তব্য-বিবৃতিতে তার ২টি সুবিধা হয়। যা বলার তা তো তিনি বললেন, সঙ্গে সঙ্গে এমন ধারণাও দিলেন, এ বক্তব্য তার একার নয়, এ ব্যাপারে সমগ্র সামরিক বাহিনী তার সঙ্গে রয়েছে। [২১]

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু তার সব সময়ই ছিল। মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই থেকে প্রকাশিত 'Gulf news' পত্রিকায় পাকিস্তানি সাংবাদিক মুসাহিদ হুসেনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এরশাদ বলেন, 'বহুদিন পূর্বে যখন জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যু হয় তখন আমি ধৈর্য ধরেছি, আমি ক্ষমতা দখল করিনি। সংবিধান অনুযায়ী আমি উপরাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দেই। তখন উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন হাসপাতলে।[২২]

চতুর্থ সংশোধনী আইনের পর থেকে রাষ্ট্রপতি পদটি সাজানো হয় অত্যন্ত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য। অসামান্য দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, ক্ষমতা প্রয়োগে পারদর্শী যোগ্য হয়ে ওঠে সে পদ। প্রাজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপযোগী হয়ে ওঠে সে পদ। বয়স, স্বাস্থ্য ও পেশাগত অভিজ্ঞতার কারণে বিচারপতি সাত্তার কোনো দিন সে পদে স্বস্তি পাননি। বারে বারে হোঁচট খেয়েছেন। সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য তিনি তাকিয়েছেন এদিক-ওদিক। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এরশাদ ও তার সহযোগীরা তা লক্ষ্য করেন। ক্ষমতা দুর্গের সব দরজার দিকে রাখেন সতর্কদৃষ্টি। বিচারপতি সাত্তারকে সামনে রেখেই তারা নিপুণভাবে ক্ষেত্র রচনা করেন ক্ষমতা দখলের। সংবিধান অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হয় এবং সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর। ওই নির্বাচনে এরশাদ এবং তার সহযোগীরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কোনো প্রার্থী তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য তা তারা খোলাখুলি বলেন। নির্বাচনী প্রচারণায় বিচারপতি সাত্তার নিজের সম্পর্কে বলেন, 'প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আস্থাভাজন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে শ্রদ্ধেয় আমি।'[২৩]

নির্বাচনের ৫ সপ্তাহ পূর্বে এরশাদ বুঝতে পারলেন নির্বাচনে ড. কামাল হোসেনের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। তাই কোনো প্রকার ঝুঁকি নিতে তিনি রাজি হননি। সামরিক বাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব দেয়ার মতো ঔদ্ধত্য দেখান। বিচারপতি সাত্তার এ প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেন, এ মুহূর্তেই তিনি বঙ্গভবন ছেড়ে চলে যাবেন।[২৪]

এরশাদ এরপর আর এগুতে সাহস পাননি। নির্বাচনের পরেও এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে শান্তিতে থাকতে দেননি। মাত্র ৪ মাসে তাকে সামলাতে হয়েছে ৪ হাজার ফ্রন্ট।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়টি একটি রাষ্ট্রপতি কমিটির দ্বারা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। এ অবস্থায় সাত্তার এরশাদের দাবির সঙ্গে তার নীতিমালার সমন্বয় সাধনে একমত হন। রাষ্ট্রপতি থাকা নিরাপদ মনে করছিলেন না। এমতাবস্থায় একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্রপতি সাত্তার জেনারেলদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং ফল হিসেবে ১০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় (১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি)। ৩ বাহিনী প্রধান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বললেন, তারা এ পরিষদে যোগ দেবেন না। কারণ, সেখানে সিভিলিয়ান মন্ত্রীদের সংখ্যা বেশি। এটা ছিল সিভিল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। প্রেসিডেন্ট সাত্তার দাবি মেনে নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ৬ জন করেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ মন্ত্রিসভার চেয়ে শক্তিশালী কোনো সংস্থার ভূমিকা নিতে পারবে এ আশঙ্কায় অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়ে।

আওয়ামী লীগ পার্লমেন্টারি পার্টির নেতা (অব.) শওকত আলী সংসদ অধিবেশনে অভিযোগ করেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল একটি Supra Government হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে অর্থাৎ সরকারের খাড়া করে দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচিত হয়নি। সে জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[২৬]

এ সময় জেনারেল ওসমানি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিপ্রায়ের নিন্দা করেন।

এরশাদ সেনাবাহিনীর আইন-কানুন ও শৃঙ্খলাকে দারুণভাবে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক নেতার মতো বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। তেজগাঁও কলেজের বার্ষিকক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এবং মুক্তিযোদ্ধা সমাজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অপর এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দানকালে দেশের প্রশাসনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা দাবি করে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন।[২৭]

এরশাদের এসব কর্মতৎপরতায় রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এরশাদ সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে উৎখাত করবেন।[২৮]

এ সংকটের নিরসন ও ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রের ধারা রক্ষার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। মেজর জেনারেল শামসুজ্জামানকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা যায়। তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরীকে টেলিভিশন ও বেতারে সংবাদ পরিবেশন করার নির্দেশ দেন এবং মেজর জে. শামসুজ্জামানকে তার নতুন নিয়োগের

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী জাতীয় সম্প্রচারে ঘোষণা দেয়ার পরিবর্তে এরশাদকে অবহিত করেন। ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবার কথা ছিল ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ। তা না হয়ে ২৪ মার্চ এসেছিল বিচারপতি সাত্তারের পদত্যাগের খবর।[২৯]

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শহিদুল ইসলামের লেখায় ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চের নাটকীয় ঘটনার একাংশ ধরা পড়েছে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে :

'স্থান সেনা সদর কনফারেন্স রুম। তারিখ ২৩ মার্চ ১৯৮২। সময় রাত ৮.৩০ মিনিট। উপস্থিত আছেন জেনারেল রহমান, জেনারেল নুরুদ্দিন, ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান (ডিএমও), ব্রিগেডিয়ার আমছা আমিন এবং ঢাকা ও অন্যান্য সেনানিবাসের গুটিকয়েক ব্যাটালিয়ন ও ব্রিগেড কমান্ডার। নির্ধারিত সময় কনফারেন্স কক্ষে প্রবেশ করলেন সেনাপ্রধান এরশাদ। ভীষণ উত্তেজিত মনে হলো তাকে। কুঞ্চিত কপালের বিস্তৃত অবয়বজুড়ে মৃদু ঘামের ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুপাত সবার দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উপস্থিত সবাইকে জানালেন এরশাদ : 'জিয়ার মৃত্যুর পর দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছি আমি। তারও আগে সেনাবাহিনীকে সংগঠিত ও সংহত করতে কি না করেছি আমি। তুলনাহীন আনুগত্য ও ত্যাগের মাধ্যমে আমি সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে সেনাবাহিনী ও জাতির সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। অথচ আজ রাষ্ট্রপতি সাত্তার রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সংক্রান্ত কথাবার্তা নিয়ে বরখাস্ত করতে চাচ্ছেন আমাকে"।[৩০]

বাংলাদেশে ১৯৮২ সালে সামারিক শাসন জারির কারণ :

সামরিক অভ্যুত্থান কোথাও অকস্মাৎ ঘটে না। অভ্যুত্থানের পূর্বে কতগুলো লক্ষণ সমাজে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, তীব্র গণঅসন্তোষ, দলীয় পর্যায়ে অসহিষ্ণুতা, সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম, সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি ব্যাপকভিত্তিক হয়ে ওঠে। একটা সচেতন নিরীক্ষার পরই অভ্যুত্থান ঘটে এমন সময়ে যখন সামরিক কর্মকর্তারা নিশ্চিত হন যে সামরিক শাসন প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে না। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকে রাষ্ট্রপতি জিয়ার হত্যাকান্ড, বিচারপতি সাত্তারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বিএনপির মধ্যে প্রকাশ্যে চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে একটি প্রেক্ষাপট রচিত হয় সামরিক শাসনের পক্ষে।[৩১]

তবে কোনো দেশে সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখল ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত. সামরিক বাহিনীর সাংগঠনিক শ্রেষ্ঠত্ব। দ্বিতীয়ত. সামরিক বাহিনীর সার্বিক স্বার্থ। তৃতীয়ত. দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন্দল ও দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক এলিটদের জনপ্রিয়তা হ্রাস।[৩২]

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশের সামরিক শাসন জারিকে নিম্নোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমত. বাংলাদেশের সামরিক কর্মকর্তারা যে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন তা প্রমাণিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, ৩রা নভেম্বর, ৭ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর ও ১৯৮১ সালের ৩০ মের অভ্যুত্থান বা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায়। এসব অভ্যুত্থান বা অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার প্রত্যেকটি সংগঠিত হয় সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা। ৩০ মের ঘটনা এদিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ ঘটনার পর সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভাব প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে।

দ্বিতীয়ত. যে কোনো দেশে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক ও সার্বিক স্বার্থ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকে। মূলতঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম লাভ করলেও এ দল কোনো সময় একটি সুসংহত দলে রূপান্তরিত হয়নি। জন্মক্ষণ থেকে এ দল ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছুসংখ্যক নেতার সম্মিলিত প্লাটফর্ম মাত্র। পিকিংপন্থী, জাতীয় আওয়ামী পার্টির একাংশ ও মুসলিম লীগ, ইউপিপি দলের একজন নেতা, বাংলাদেশ শ্রমিক দলের কিছু কর্মী এবং তফসিলি ফেডারেশনের সহযোগে গঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলটি ২টি সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্ব এবং অন্যটি ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার আকর্ষণ।[৩৩] জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাই জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। দলীয় সংহতি রক্ষার্থে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হতে হয়, যদিও বয়স ও কর্মক্ষমতা কোনো দিক থেকেই তিনি রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব পালনের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন না। কারণ তার বয়স ছিল ৭০-এর অধিক। সর্বক্ষেত্রে নিজে উপস্থিত হয়ে তার পক্ষে সকল সমস্যা পর্যবেক্ষণ করা খুব দুরূহ ছিল। সুতরাং শক্তভাবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ ব্যক্তি হিসেবে প্রেসিডেন্ট সাত্তারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে নির্বাচনের পর মন্ত্রিপরিষদ গঠনকে কেন্দ্র করে দলীয় কোন্দল আরো বৃদ্ধি পায়। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। জিয়া সরকারের বেশিরভাগ সদস্যের সততা সম্পর্কে জনমনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। বেশ কিছুসংখ্যক মন্ত্রীর দুর্নীতির বিষয়ে অনেক

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। মন্ত্রিপরিষদে যোগদানের পর অনেকেই দুর্নীতির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সর্বমোট ১৪ মন্ত্রীর দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। এসব মন্ত্রীর মন্ত্রিপরিষদে যোগদানের পূর্বে বাড়ি-গাড়ি ও অর্থ সম্পদ তেমন কিছুই ছিল না। মন্ত্রীদের এ ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশিত হলে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়া ২টি গোয়েন্দা সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দেন। কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই তিনি নিহত হন। বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই এ তদন্তকার্য সমাধা করার নির্দেশ দেন।[৩৪]

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হলো ওই সময়ে তৎকালীন যুবমন্ত্রী আবুল কাশেমের মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে একটি চমকপ্রদ ঘটনার সৃষ্টি হয়। প্রায় ৬ ঘণ্টাকাল যুবমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে বিকাল ৪টায় উর্ধ্বতন প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে নাখালপাড়ার আলী হোসেন হত্যা মামলার আসামি এমদাদুল হককে (ইমদু) গ্রেফতার করে। ইমদুকে গ্রেফতারের আগে পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র সাদা পোশাকধারী লোকেরা আশপাশের বাড়ির ছাদ, গ্যারেজ ও প্রাচীরের ওপর অবস্থান নিয়ে সকাল ১০টা থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। এ এলাকায় অবস্থিত কয়েকজন বিচারপতির বাড়ির আঙিনায় ও ছাদে পুলিশ অবস্থান গ্রহণ করে। যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক আব্দুল মতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ইমদুকে গ্রেফতারের অনুমতি দেন। যুবমন্ত্রীর আপত্তির মুখে উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুমতিক্রমে ইমদুকে গ্রেফতার করেন।[৩৫]

ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন সরকারের জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে হ্রাস পায়। মন্ত্রীর বাসভবনে আশ্রয়লাভকারী এ ধরনের একজন খুনিকে গ্রেফতারের ফলে মন্ত্রিসভা নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে স্বগঠিত মন্ত্রিসভার সতর্কতা, আনুগত্য, ন্যায় পরায়ণতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে জনগণের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। মাত্র ৪ মাস সময়ের মধ্যে সাত্তার কর্তৃক ২ বার মন্ত্রিপরিষদ গঠন এ সরকারের দুর্বলতার পরিচয় বহন করে। এ সময় দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। বিচারপতি সাত্তার নিজেই বলেন, 'সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুদায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছেন তাদের অনেকেরই কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা ও অবহেলা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা ও দেশের মঙ্গল সম্পর্কে নির্লিপ্ততা এবং দুর্নীতি পরায়ণতার ফলে দেশের সামগ্রিক অবনতি ঘটছে।'[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

পর্যুদস্ত জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা আরো সংকটজনক হয়ে ওঠে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জানুয়ারিতে (৮২) মাত্র ১৯৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। এসব কারণে দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি কাটছাঁট করতে হয়। দেশের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। চট্টগ্রামের সিএস গুদাম থেকে কোটি টাকার খাদ্যশস্য উধাও হয়ে যায়।[৩৭]

এসব খাদ্যশস্য পাচারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা উদঘাটিত হলে জনমনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এভাবে দেশে দ্বিতীয়বার সামরিক শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

তৃতীয়ত. রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাসন ব্যবস্থায় বেসামরিকীকরণের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন তা ছিল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের অধিপত্যের প্রেক্ষাপটে। ফলে সামরিক কর্মকর্তাদের শাসন ব্যবস্থা ও সরকারের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান ছিল। বিএনপি সরকারের দুর্বলতা ও জনপ্রিয়তা হ্রাসের সুযোগে এরা প্রাকাশ্যভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৮২ সালের সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্রে জেনারেল এরশাদ উল্লেখ করেন, যেহেতু দেশে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে যখন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেসামরিক প্রশাসন আইন কার্যকর ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। সব স্তরে সীমাহীন দুর্নীতি জীবনের অংশ হয়ে ওঠায় জনগণের জন্য দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতিতে। জনসাধারণের সম্মানজনক জীবনযাপন, শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছে। রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। যেহেতু দেশের জনগণ চরম দিশেহারা অবস্থা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত। যেহেতু জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর দায়িত্ব বর্তেছে। যেহেতু আমি লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এবং আমাদের মহান দেশপ্রেমিক জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে ২৪ মার্চ ১৯৮২ বুধবার হতে বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সব ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছি এবং এ মুহূর্ত থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভুক্ত বলে ঘোষণা করছি। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমি বাংলাদেশের সব সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছি।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ২৫ মার্চ অপরাহ্নে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভাষণে সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য কামনা করে বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে, জাতীয় স্বার্থে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।[৩৯]

জেনারেল এরশাদ দেশে সামরিক শাসন জারির পক্ষ সমর্থন করে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের কথা উল্লেখ করেন। যাতে তিনি বলেছিলেন, 'সমাজ জীবনে আজ এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, যার যত ক্ষতি করার ক্ষমতা তার তত বেশি প্রতিপত্তি। সমাজে যারা সৎ ও ভালো মানুষ তারা বড় অসহায় অবস্থায় কাল কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। ধীরে ধীরে ভালো মানুষেরা জনজীবন থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। ফলে সমাজে অসৎ ও দুর্নীতিবাজদের দাপট ও প্রতিপত্তি বেড়েই চলছে। আজ আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধের এমন এক ভয়াবহ অবস্থা ঘটেছে যে সাহসিকতার সঙ্গে এর মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হলে আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে আমাদের সম্মান বিপন্ন হয়ে পড়বে। জেনারেল এরশাদ বলেন, জাতীয় এ দুর্যোগের দিনে সেনাবাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। আর তাই সামরিক শাসন হয়ে পড়েছে অত্যাবশ্যক।"[৪০]

১৯৮২ সালের সামরিক শাসন জারির কারণ সম্পর্কে সরকারি ভাষ্য বর্ণনা করা হলো। এছাড়া ওই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ২টি সাক্ষাৎকার অংশ তুলে ধরছি তাহলো :

১. জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর থেকেই এরশাদ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন আর তাই সুযোগ বুঝে নানা কারণ উপস্থাপন করে ক্ষমতা দখল করেন। অর্থাৎ ক্ষমতার মোহই ছিল ১৯৮২ সালের সামরিক শাসন জারির প্রধান কারণ।[৪১]

২. ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের দুর্বলতা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি অর্থনৈতিক সংকট এবং ক্ষমতাসীন সরকারের অদূরদর্শিতাই রাজনীতিতে সামরিক শাসন আগমনের প্রত্যক্ষ কারণ বলে প্রতীয়মান।[৪২]

মূলত: ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মোহ থেকেই রাজনীতিতে সামরিক শাসকদের আগমন ঘটে। তথাপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যখন দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে, মুদ্রাস্ফীতি দ্রব্যমূল্যর ঊর্ধ্বগতি চরম পর্যায়ে পৌছতে থাকে তখন সেনাবাহিনীও ব্যারাকে বসে থাকে না, তারা রাজনীতিতে নিজেদের অধিকার দাবি করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী সময়ে দেশ রক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা বেসামরিক সরকারের ব্যর্থতাকেও চিহ্নিত করতে পারি এবং বাংলাদেশে পর পর সামরিক অভ্যুত্থান এবং ১৯৮২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে এসব কারণ ক্রিয়াশীল ছিল বলে ধরে নিতে পারি।

তথাপি ১৯৮২ সালের অভ্যুত্থানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এটি সুপরিকল্পিত এবং পূর্বে বাংলাদেশে যেসব অভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলোর মতো হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা অভ্যুত্থান এটি নয়। সময় নিয়ে ঠান্ডা মাথায় লাভ-লোকসানের মূল্যায়ন করেই এর পরিকল্পনা করা হয়। তাছাড়া এ অভ্যুত্থানে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ যতটুকু জড়িত ছিল তার থেকে অনেকগুণ বেশি ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা জেনারেল এরশাদের উচ্চাভিলাষ।[৪৩]

পাদটীকা

১. ড. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩৫৮।

২. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ, ১৮৬১-২০০১। হাসিনা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩১৬।

৩. এলাহী নেওয়াজ খান সম্পাদনায়, এরশাদের উত্থাত পতন, ওয়েসিস বুকস ঢাকা, ১৯৯১ পৃষ্ঠা-৪।

৪. মেজর রফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের নয় বছর ইউপিএল ঢাকা, ১৯৯১ পৃষ্ঠা-৩৬।

৫. রুহুল আমিন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারার নেতৃত্ব, হীরা বুক মার্ট, ঢাকা, ১৯৯৩ পৃষ্ঠা-১০।

৬. মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা। ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৭।

৭. রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭।

৮. পিটার নেসওয়াল্ডের সঙ্গে জে. এরশাদের সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্যঃ The holiday, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮১।

৯. The holiday, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮১।

১০। মওদুদ আহম্মেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১ অক্টোবর, ১৯৯৪।

১১. মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৭।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ফয়েজ উদ্দিন আহম্মেদ, পাঁচ শতকের স্মৃতিকথা, পরমা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৯।

১৩. ইউসুফ মুহাম্মদ সম্পাদিত, অ্যালবামঃ গণআন্দোলন (১৯৮২-৯০) ১ম খন্ড, তোলপাড়, চট্টগ্রাম , ১৯৯৩ পৃষ্ঠা-৯, ৫।

১৪. বিচিত্রার সঙ্গে জেনারেল এরশাদের একান্ত সাক্ষাৎকার বিচিত্রা, ১৯-০৬-১৯৯১।

১৫. এমাজউদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, প্রকাশক শেখ মো. ইসমাইল হোসেন, ঢাকা-১৯৯১, পৃষ্ঠা, ৫৭-৬০।

১৬. The international Herald Tribune 27 August 1981.

১৭. এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭।

১৮. The Gurdian (London) 7 October, 198.

১৯. ইউসুফ মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫

২০. D. Sen 'Bangla Army Chief Issues on pole in Gevement' The Hindustan Tims, 22 November, 1981.

২১. এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত-৫৭-৫৮।

২২. এমাজউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮।

২৩. এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৮-৫৯।

২৪. এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯।

২৫. এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০।

২৬. তৎকালীন সংসদ অধিবেশনের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য। দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪-০১-১৯৯২।

২৭. লন্ডন থেকে প্রকাশিত দি গার্ডিয়ান ৭ অক্টোবর ১৯৮১ ও নিউইয়র্ক টাইমস, ১৪ অক্টোবর ১৯৮১ সংখ্যায় এরশাদের সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়।

২৮. সাক্ষাৎকার : বদরুদ্দোজা চৌধুরী, (জাতীয় সংসদের উপনেতা), ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।

২৯. মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭।

৩০. মেজর রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬১।

৩১. ৩১ অধ্যাপকএমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২ পৃষ্ঠা-৩৯।

৩২. আধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহম্মদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি. ঢাকা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৪৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩. আধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহম্মদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা, বাংলাদেশ বুক কপোরেশন লি. ঢাকা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা-৪৭২।

৩৪. রফিকুল ইসলাম প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৫

৩৫. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৫।

৩৬. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২২।

৩৭. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭৩।

৩৮. Martial Law Proclamation order, Registered No. DA 1. The Bangladesh Gazette Extraordinary Published by Authority. Wednesday, March 24, 1982.

৩৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫-০৩-১৯৮২, সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পা.), গণআন্দোলন, ১৯৮২-৯০, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১২।

৪০. নুরুল ইসলাম, (বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি) এর ভাষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের অভিষেক অনুষ্ঠান ১৬ মার্চ ১৯৮২।

৪১. সাক্ষাৎকার গ্রহণ : বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

৪২. সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মোহাম্মদ হানিফ, ৬ অক্টোবর, ১৯৯৪।

৪৩. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, ৫৬-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

২. খ. জেনারেল এরশাদের শাসনামল : বেসামরিকীকরণের মাধ্যমে রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রক্রিয়া :

i. প্রাথমিক কর্মকান্ড : ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এক রক্তপাতহীন সমরিক অভ্যুত্থানের মাধমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেই আইনশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির মূলোৎপাটনের প্রতিশ্রুতি দেন। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করার পর পূর্বের সামরিক শাসকদের মতো অঙ্গীকার করেন যে, তিনি কখনই রাজনীতিতে জড়াবেন না, নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন দুর্নীতির মূলোৎপাটনের, অর্থনৈতিক উত্তরণ, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার।

সামরিক শাসন জারির অব্যবহিত পরেই লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে তিনি কতিপয় সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। সিদ্ধান্তগুলো ছিল নিম্নরূপ :–

- সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করা হয়।
- জাতীয় সংসদকে ভেঙে দেয়া হয়।
- মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়।
- সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়।
- স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা।
- সরকার প্রধান হিসেবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার কাজে সাহায্য করার জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।
- সময়ে সময়ে জারিকৃত সামরিক বিধির সাহায্যে দেশ শাসন করা হবে।[১]

এরপর ৯ বছর পেরিয়ে গেছে ৫টি লক্ষ্যের কোনোটিই অর্জিত হয়নি। [২] অবশ্য ওই ঘোষণা অনুযায়ী জে. এরশাদ সরকার ও শাসন ব্যবস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খান ও বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদকে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। জে. এরশাদ সমগ্র দেশকে ৫টি সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং ৫ জন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশাসনকে আরো দক্ষ ও নিপুণ করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। প্রথমে উপদেষ্টারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১২ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। পরে এর সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ১৪।

ইতিমধ্যে সরকার তার কতিপয় প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেন। যা ছিল নিম্নরূপ :–

- দেশকে সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।
- সর্বগ্রাসী দুর্নীতির কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করা।
- সামগ্রিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের ধ্যান-ধারণার কার্যকর প্রতিফলন ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
- সুখী ও সমৃদ্ধশীল এবং শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।
- একটি কর্মক্ষম ও সংবেদনশীল প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা যা জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।
- ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে আপামর জনসমষ্টির ভাগ্যোন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।
- একটি সর্বজনগ্রাহ্য স্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে অসৎ রাজনীতির শিকার হতে পরিত্রাণ দেয়া।
- বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ ও দ্রুত বিচার কার্য সম্পাদন।
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন।

প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করার পর জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জনগণের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের অনুকরণে তার সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ দফাগুলো নিম্নরূপ :–

- অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুফল লাভ করা।
- ধনী ও দারিদ্র্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে জাতীয় সম্পদের সমবণ্টন করা।
- গ্রামীণ উন্নয়ন সাধন করা।

Dhaka University Institutional Repository

- উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত পণ্যের যথার্থ বণ্টন ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা।
- কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
- কৃষকদের ন্যায্য পাওনার নিশ্চয়তা ও তাদের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিধানপূর্বক ভূমি সংস্কার সাধন।
- পল্লী এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে পুঁজি বিতরণ ও সরবরাহ করা।
- বেসরকারি খাতের শিল্পগুলোকে উৎসাহ দান ও বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- সমবায় ও কুটিরশিল্পের উন্নয়ন।
- প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পুনঃবিন্যাস এবং বিকেন্দ্রীকরণ ও কৃচ্ছ্রতা সাধন করা।
- ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা বিধানপূর্বক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা।
- সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা।
- জাতীয় উন্নয়ন তৎপরতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহিলারা যাতে সমাজে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেজন্য তাদের সাহায্য করা।
- জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুবিধা প্রদান।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ করা।
- রাজনীতিকে কাজের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করা এবং
- জাতীয় জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও ওই অধিকারকে সমুন্নত রাখা।[৩]

জেনারেল এরশাদ ১৯৮৩ সালের ১৭ মার্চ কুমিল্লা স্টেডিয়ামে স্থানীয় সরকার ও সমবায় প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে বলেন, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে তার সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর দেশবাসী আশা করেছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে, দুর্নীতির মূলোৎপাটন ঘটবে এবং দেশে অর্থনৈতিক সংকটের অবসান হবে। কিন্তু সামরিক শাসন জারির অল্প দিনের মধ্যে সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। আর্থ রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক অঙ্গনে যে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো, তা কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই করতে সক্ষম। এসব পদক্ষেপকে বিপ্লবী সংস্কার, দেশ গড়ার উদ্যোগ, ঔপনিবেশিক জরাজীর্ণ ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের মহান প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয়।[৪]

মূলত: দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ সামরিক শাসকের ন্যায় জেনারেল এরশাদ তার সামরিক শাসনকে উন্নয়ন ও জনমুখী প্রশাসক হিসেবে পরিচিত করার প্রয়াস চালান। এ দৃষ্টিভঙ্গির অংশ স্বরূপ তিনি জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর, প্রশাসনের ব্যয় হ্রাস এবং দুর্নীতি দমন এসব কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরপর শুরু করেন সমর্থনের ভিত্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ গঠনের প্রচেষ্টা।[৫]

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় থাকার জন্য এমন কোনো কাজ নেই যা তিনি করেননি। ক্ষমতা ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতায় টিকে থাকার সব চেষ্টা করেছিলেন।[৬]

জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের প্রচেষ্টা ও বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া :

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখলের পরই জে. এরশাদ ঘোষণা করেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তার প্রধান লক্ষ্য। এরশাদ তার সামরিক শাসনকে জনগণের সামরিক শাসন রূপে আখ্যায়িত করেন। এ প্রক্রিয়ার পথ ধরে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার সামরিক শাসনের বৈধতা অর্জনের।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল এরশাদের সামরিক সরকার 'ঘরোয়া রাজনীতির' অনুমতি প্রদান করেন। তারপর গণভোটের আয়োজন করেন। উপজেলা নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ইত্যাদি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন।

ii. ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন : জেনারেল এরশাদ তার সাময়িক শাসনের বৈধতা অর্জনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারি করেন। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের ৪,৩৫২টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করেন।

iii. ১৯৮৫ সালের গণভোট : জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজের ক্ষমতাকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্য তার আরেক সামরিক পূর্বসূরি জেনারেল জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ প্রহসনমূলক এক গণভোটের (Referendum) আয়োজন করেন। ওই গণভোটে লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিপুল আস্থা ভোট পেয়েছিলেন।[৭] রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদের নীতি ও কর্মসূচি এবং স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি পদে তার বহাল থাকা প্রশ্নে জনগণের আস্থা আছে কি না সেজন্য এ গণভোটের আয়োজন করা হয়। 'হ্যাঁ' বা 'না' এ পদ্ধতিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত বিষয়ে জনগণের আস্থাথাকলে 'হ্যাঁ' বাক্সে ও আস্থা না থাকলে 'না' বাক্সে হ্যাঁ বা না ভোট দিতে হবে। দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ধারণা শতকরা ৪-৫ ভাগ লোক এ ভোটগ্রহণ কৌতুকে অংশ নেয়। কিন্তু গণভোটে ৯৪.১৪ ভাগ ভোটার তার (এরশাদের) পক্ষে হ্যাঁ সূচক ভোট প্রদান করে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়। কিন্তু বাস্তবে ভোটারবিহীন ভোটকেন্দ্রে নির্বাচক কর্মকর্তা গণজালিয়াতির মাধ্যমে এ ফলাফল তৈরি করেন, যদিও তখনকার দেশের সব বিরোধী জোট এ গণভোট প্রত্যাখ্যান করে। দি টাইমস প্রতিনিধি বলেন, " কি করে মিথ্যাচার সহ্য করে বাঁচতে হয় সে সম্পর্কে (২২ মার্চ) বাংলাদেশ শিক্ষা লাভ করে। দেশের স্বৈরশাসনকে গণভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্রী বলে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি প্রতারণা মাত্র।[৮]

পাদটীকা

১. মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭।

২. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, প্রাগুক্ত আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২। পৃষ্ঠা-৮৬।

৩. মো. আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫৯-৬০, দৈনিক ইত্তেফাক।

৪. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২, পৃষ্ঠা-১১৯-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

৫. শওকত আরা হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩য় সংখ্যা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৩৬।

৬. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসনাত (সম্পা.), নব্বই-এর অভ্যুত্থান, মুক্তধারা; ঢাকা ১৯৯১ পৃষ্ঠা-১৯।

৭. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩৩।

৮. আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রিত্বের নয় মাস, নওরোজ, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৪৬, সূত্রঃ দি টাইমস্ লন্ডন, ২৩ মার্চ, ১৯৮৫।

iv. ১৯৮৫ সালের উপজেলা নির্বাচন : জেনারেল হুসেইন মহম্মদ এরশাদ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন তার মধ্যে একটি হলো ১৯৮২ সালের অক্টোবরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে, থানাগুলোকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং থানা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাছে সব কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন, যত দিন চেয়ারম্যান নির্বাচিত না হয় তার পরিবর্তে থানা নির্বাহী অফিসার দায়িত্ব পালন করবেন। তার আলোকে ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে স্থানীয় সরকার (উপজেলা) অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হয়। উপজেলা সৃষ্টির পর মহকুমা প্রশাসন বাতিল হয়ে যায়, প্রায় সব মহকুমাই জেলা পর্যায়ে উন্নীত হয়। পূর্বেকার ২১-২২টি জেলার স্থলে ৬৪টি জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] থানা পরিষদের স্থলে উপজেলা পরিষদ নামকরণ একটি বিপ্লব সাধন করলো।[২]

মূলত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ে তার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় ও দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়া হয়। ১৯৮৪ সালের ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৫ দল এবং ৭ দলের জোরালো আন্দোলনের মুখে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অতঃপর ১৯৮৫ সালের ১৬ ও ২০ মে দেশব্যাপী উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের নামে তা ছিল প্রহসন। অর্থ, অস্ত্র, সন্ত্রাস ও অন্যবিধ প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে প্রার্থীরা ভোটকেন্দ্র দখল করে প্রিজাইডিং অফিসারদের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে সিল মেরে বাক্সভরে নিজেদের জয় পরাজয় নির্ধারণ করে। সরকারের অর্থ বলেই তারা বলীয়ান ছিলেন। যারা নির্বাচিত হলেন সবাই সরকারের এজেন্টে পরিণত হলেন। জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ এ নির্বাচনের মাধ্যমে তার নিজস্ব রাজনৈতিক ভিত্তি গঠনে প্রয়াসী হন।[৩] বিরোধী দলীয় জোট ও দলগুলো উপজেলা নির্বাচন বর্জন করে।

পাদটীকা

১. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ ১৮৬১-২০০১, হাসিনা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩২৪।

২. মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৭১।

৩. ড. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩২৪।

v. জাতীয় পার্টি গঠন এবং রাজনীতিতে এরশাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ : রাজনৈতিক দল গঠন ছিল জেনারেল এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম পদক্ষেপ। এরশাদ তার পূর্বসূরি জেনারেল জিয়াউর রহমানের মতো ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং বিভিন্ন দল ভেঙে তার নিজস্ব দল গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেন। অনেকেই মন্ত্রীত্বের লোভে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের সঙ্গে হাত মেলান। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে জনদল নামে একটি নতুন দলের জন্ম হয় এ সময় একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করা হয়। জনদল, বিএনপি (শাহ), মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী), ইউপিপি ও গণতান্ত্রিক পার্টি মিলে এ জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। মূলত দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় তার ১৮ দফা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে।

তিনি ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণার পর বলেন, আমরা রাজনীতিকে কাজের রাজনীতিতে পরিণত করতে চাই, অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতার সুফল জনগণের কাছে পৌছে দিতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জেহাদ ঘোষণার কথা পুনঃউল্লেখ করেন। প্রতিটি থানা প্রশাসনে একটি করে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি থাকবে এবং দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য জনগণের সাহায্য কামনা করেন। অথচ আমরা দেখতে পাই জাতীয় পার্টি দল ছুট নীতি ভ্রষ্ট এবং ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তখন ক্ষমতালিপ্সু, দুর্নীতিবাজ অনেক রাজনীতিক জাতীয় পার্টিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও জাতীয় পার্টিতে যোগদানের পরে নির্দোষ হয়ে যায়। ফলে এটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংগঠনের মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সভাপতি ও সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে এ সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেনারেল এরশাদ। দল ও সরকার একত্রিত হয়ে এমন কাঠামোর অধীনে

Dhaka University Institutional Repository

ন্যস্ত হলো, যা একান্তই ব্যক্তির স্বার্থের ব্যবহারকে নিশ্চিত করা হয়েছে তাই প্রথম থেকেই দলটির ভিত্তি ছিল দুর্বল ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক।[১] তার প্রমাণ পরবর্তীতে দলটি রেখেছে বারবার। জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি রাজনীতির অনুমতি দিলে ৫ দলের সমন্বয়ে গঠিত 'জাতীয় ফ্রন্ট' জনদল হিসেবে ১ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করে। এ নতুন দলের নামকরণ করা হয় 'জাতীয় পার্টি'। ধানমন্ডির জাতীয় ফ্রন্টের কার্যালয়ে জাতীয় পার্টির ২১ সদস্য বিশিষ্ট সভাপতিমন্ডলী, ১৮ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও ৬০১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং সাবেক জনদলের নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সভাপতিমন্ডলীর এক নম্বর সদস্য, সচিব হন আনোয়ার জাহিদ। ওই নতুন দলের মহাসচিব এম এ মতিন চৌধুরী পার্টির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের আশীর্বাদে ও নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাব। আরো বলেন, জাতীয় পার্টির আদর্শের মধ্যে রয়েছে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতি অর্থনৈতিক মুক্তি। অতঃপর জেনারেল এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১২ জানুয়ারি বায়তুল মোকাররম স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত সভায় বলেন, দেশের রাজনৈতিক আকাশে জাতীয় পার্টি উদীয়মান সূর্য। এ পার্টি তার মূলনীতিকে স্মরণ রেখে ভাস্কর হয়ে উঠেছে। জাতীয় পার্টি আবির্ভাবে দেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করবে। জাতীয় পার্টির সঙ্গে আমার রাজনৈতিক সমন্বয় ঘটেছে। তিনি আহ্বান জানান, জনগণকে, জাতীয় পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয়ে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করুন, এর মাধ্যমেই দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।[২]

পাদটীকা

১. মোহাম্মদ সোলায়মান 'রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট : এরশাদের শাসনকাল' রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

২. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ২-১৩ জানুয়ারি, ১৯৮৬।

vi. **তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন:** ১৯৮৫ সালের গণভোট ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সমগ্র দেশে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সীমিত পর্যায়ে রাখা হয়। ১৯৮৬ সালের ২ মার্চ রেডিও এবং টেলিভিশনে এক ভাষণে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ অবাধ রাজনীতির আশ্বাস দিয়ে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তার ভাষণে তিনি বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিরোধী দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে তাদের সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোনো প্রচার করা হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ আদেশ আগামীকাল থেকে কার্যকর হবে। পরদিন ২২ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালিত হয়।[২] ২১মার্চ জেনারেল এরশাদের জাতীর উদ্দেশ্যে ভাষণের পর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ৭ মে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।[৩] আওয়ামী লীগসহ ৮ দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার জন্য অনড় থাকেন। ১৫ দলের ৫টি বামপন্থী দল ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৫ দল থেকে বেরিয়ে ৫ দলীয় জোট গঠন করেন। ৮ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচনী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ব্যালটের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।[৪]

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, ৭ মে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক "ম্যান্ডেট", যা জাতীয় ঐক্যের সূচনা করবে, তিনি আরো বলেন, নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে রচিত হয়েছে তার উল্টো চিত্র। ৭ মে সারাদেশের হিংসাত্মক ও হাঙ্গামার মধ্যদিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ২৮৪টি ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। ওই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, জাসদ (রব), জাসদ (সিরাজ) ও ওয়ার্কার্স পার্টি (নজরুল) ইত্যাদি দল অংশ নেয়।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের ফলাফল

সারণী-১

১৯৮৬ সালের তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল চিত্র :

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটার শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	৩০০	১৫৩	৪২.৩৪
আওয়ামী লীগ	২৫৬	৭৬	২৬.১৬
এনএপি	১০	৫	১.২৯
কমিউনিস্ট পার্টি	৯	৫	০.৯১
বাকশাল	৬	৩	০.৬৭
জাসদ (সিরাজ)	১৪	৩	০.৮৭
ওয়ার্কার্স পার্টি	৪	৩	০.৫৩
ন্যাপ (মোজাফ্ফর)	১০	২	০.৭১
গণআজাদী লীগ	১	---	০.৮৮
জামায়েত-ই-ইসলাম	১৩৮	১০	৪.৬১
জাসদ (রব)	৭৬	৪	২.৫৪
মুসলিম লীগ	১৩৮	৪	১.৪৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	৬০০	৩২	১৬.১৯
মোট=	১৫২৭	৩০০	১০০

Source : Government of the people's Republic of Bangladadesh. Election Commission, Report : Jatiya Sangshad Elections, 1986, Dhaka, 1988.

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনে, তারা আরো অভিযোগ করে নির্বাচনে 'মিডিয়া ক্যু' হয়েছে। ওই দুষ্কর্মে নির্বাচন কমিশন ও তাদের কর্মচারীরা সহায়তা করে।[৬] জাতীয় পার্টির কর্মীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে বোমা মেরে ও লোকজন তাড়িয়ে দিয়ে ফাঁকা মাঠে ব্যালট বাক্স ভরে দেয়। তখন অন্যান্য পার্টির লোকজন কেন্দ্র ছেড়ে চলে যায়। এ নির্বাচনকে প্রহসনের নির্বাচন বলাই শ্রেয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ মে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নতুন মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন (২৬ মন্ত্রী, ৬ প্রতিমন্ত্রী ও ৩ জন প্রতিমন্ত্রী) [৭]

১০ জুলাই তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। ওই সংসদে সামসুল হুদা চৌধুরী স্পিকার, এম কোরবান আলী ডেপুটি স্পিকার, মিজানুর রহমান সংসদ নেতা এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ এ অধিবেশন বর্জন করে। তৃতীয় জাতীয় সংসদে ৩৯টি বিল গৃহীত হয়েছিল। এ সংসদের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো সংবিধানের ৭ম সংশোধনী বিল পাস, জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলসহ সামরিক শাসন হিসেবে তার সব আদেশ ও অধ্যাদেশ বৈধ বলে সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয়। তৃতীয় জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ৭ ও ১৫ দলীয় জোট সংসদ বাতিলের দাবি জানাতে থাকে। সব জোট তৃতীয় সংসদকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করে। এ সংসদের মোট কার্যদিবস ছিল ৭৫ দিন। মেয়াদপূর্তির আগেই ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর সংসদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৮]

পাদটীকা

১. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা মার্চ, ১৯৯৮৬।

২. ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৭।

৩. Muhamad A. Hakim, Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interregnum, University Press limited, Dhaka, 1993, P-23.

৪. Laurence Ziring, Bangladesh from Mujib to Ershed An Interpretive study, Universty Press limited, Dhaka, 1992, P-195.

৫. Muhammad A. Hakim. op, Cit. P: 25-26.

৬. আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রিত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা-১৭১-১৭৩।

৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা-২৬ মে, ১৯৮৬।

৮. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৯৮-১৯৯।

vii. ১৯৮৬ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন : ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ অবৈধভাবে যে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা বৈধ করার অপচেষ্টায় এ নির্বাচন।[১] দেশের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ১৫

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। জাতীয়তাবাদী দলের মতো আওয়ামী লীগসহ আট দল এবং অধিকাংশ বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন করে। মাত্র ২টি দলের প্রতিনিধি এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এরা হলেন–জাতীয় পার্টির হুসেইন মহম্মদ এরশাদ, খেলাফত আন্দোলনের আমীর মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর। জাসদ (রব) প্রকাশ্যভাবে এরশাদকে সমর্থন করে। দীর্ঘদিন প্রবাসে কাটানোর পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় সবাকেই হতবাক করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। এ নির্বাচনে এরশাদসহ ১২ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যারা প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছেন তাদের নাম ও প্রতীক নির্বাচন কমিশনপ্রদত্ত তালিকা অনুসারে প্রদত্ত হলো :–

অলিউল ইসলাম (সুক্কু মিয়া)- কুঁড়েঘর. আলহাজ্ব মেজর (অব.) মো. আনসার উদ্দিন- তলোয়ার, মুহাম্মদ আনসার আলী- পাগড়ি, মোহাম্মদ উল্লাহ্ হাফেজ্জি হুজুর- বটগাছ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মজুমদার- গোলাপ ফুল, মো. আবদুস সামাদ– দাঁড়িপাল্লা, মো. জহির খান- নৌকা, লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান– ধানের শীষ, সৈয়দ মনিরুল ইসলাম চৌধুরী- হাতঘড়ি, স্কোয়াড্রন লিডার (অব. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী- ছাতা, আলহাজ্ব মাওলানা খায়রুল ইসলাম- খেজুর গাছ, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-লাঙল।[২]

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো যেমন : ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিরোধিতা করায় এরশাদের সামরিক সরকার নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৮৬ সালের ১৫ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বিরোধী দলগুলোর ডাকা হরতালের মধ্যে। এ নির্বাচনে এরশাদ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন বলে ঘোষণা করা হয়। ২০ অক্টোবর সরকারিভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২ কোটি ১৭ লাখ ৯৫ হাজার ৩৩৭ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত আন্দোলনের প্রার্থী মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জি হুজুর ১৫ লাখ ১০ হাজার ৪৫৬ ভোট পান।[৩] তৃতীয় স্থানে ছিলেন লে. কর্নেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান। তিনি পেয়েছিলেন ১১ লাখ ৭৩ হাজার ৭২৩ ভোট। এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেশের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৩৯ লাখ ১২ হাজার ৪৪৩ জন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর এইচ এম এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।[৫] এরশাদ বলেন, জাতির প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, সরকারের আরও বেশি গণতন্ত্রায়ন, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিল্প ভিত্তি গড়ে তোলা এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে প্রশাসনিক সংস্কার সাধন।

মূলত: ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জেনারেল এরশাদের শাসনকালকে বৈধ করার ক্ষেত্রে চতুর্থ নির্বাচনী প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা চলে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে এরশাদ তার শাসনকালকে সম্পূর্ণরূপে বেসামরিকীকরণ করতে সক্ষম হন।

পাদটীকা

১. আতাউর রহমান খান, প্রধান মন্ত্রিত্বের 'নয় মাস' ঢাকা, ১৯৮৮,পৃষ্ঠা-১৭১-৭৩।

২. ৫. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬।

৩. দৈনিক বাংলা, ঢাকা, ২১ অক্টোবর , ১৯৮৬, ২১ অক্টোবর।

৪. ১০. দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকা, ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬।

৫. আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৭৭।

viii. **১৯৮৮ সালের চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন :** জরুরি অবস্থা ঘোষণা সত্ত্বেও বিরোধী জোট ও দলগুলোর এক দফাভিত্তিক দুর্বার আন্দোলনের মুখে ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।[১] ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দলের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়। আন্দোলনরত সব জোট দল জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অধীনে আর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা দেন।

বিরোধী দলগুলোর মনোভাব জেনেও জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ঘোষণা অনুযায়ী ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করে। আন্দোলনরত সব জোট ও দল এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচন প্রতিরোধ করার ডাক দেয়। বিরোধী দলগুলো নির্বাচন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ১৭, ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে ঘেরাওসহ প্রতিরোধমূলক

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচি ঘোষণা করে জেনারেল এরশাদের প্ররোচনায় নির্বাচন কমিশন এরমধ্যে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে পুনরায় ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে পাশাপাশি ১৯৮৮ সালের ২৫ জানুয়ারি সরকার এক নতুন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সব ধরনের নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করে।[২]

অবশেষে পুনরায় আরেকটি ভোটার এবং প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়। নির্বাচনে কোনো বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেনি। এ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি ও জেনারেল এরশাদ সমর্থক কমবাইন্ড অপজিশন পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ) ও ফ্রিডম পার্টিসহ মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে। পূর্ব নির্ধারিত ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। এতে যথারীতি জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয়লাভ করে বলে সরকারি ঘোষণায় বলা হয়।[৩] বিরোধী দল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত এ নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ :–

সারণী- ২

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (১৯৮৮) ফলাফল চিত্র

দলের নাম	আসন লাভ	প্রাপ্ত ভোট	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	২৫১	১,৭৬,৮০,১৩৩	৬৮.৪৪
সম্মিলিত বিরোধী দল	১৯	৩২,৬৩,৩৪০	১২.৬৩
জাসদ (সিরাজ)	৩	৩,০৯,৬৬৬	১.২০
ফ্রিডম পার্টি	২	৮,৫০,২৮৪	৩.২৯
স্বতন্ত্র পার্টি	২৫	৩৪,৮৭,৪৫৭	১৩.৫০
অন্যান্য দল	-----	২,৪২,৫৭১	০.৯৪

Source : Government of the people's Republic of Bangladadesh. Press Information Department, A Background paper on Bangladesh fifth parliament (Jatiya Sangsad) Election, handout No: 429, February 20.1991.

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর, ১৯৮২-৯০, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৯১ পৃষ্ঠা-৭৭।

২. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ, হাসিনা প্রকাশনী, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৩৪১।

৩. ড. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪২।

ix. সংবিধান সংশোধনীসমূহ :

সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী : ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর মাত্র এক দিনের জন্য তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন মাত্র ৬ ঘণ্টার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী আনা হয়। সেদিনই সংবিধানের সপ্তম সশোধনী সংসদ কর্তৃক গৃতীত হয় এবং ওই দিনই বিলটি রাষ্ট্রপতি (জেনারেল এরশাদের) কাছে উথাপন করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ পরের দিন (১১ নভেম্বর ১৯৮৬) বিলটিতে তার সম্মতি প্রদান করেন।

ওই সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের পদের মেয়াদ ৬২ বছরের স্থলে ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় এবং এটি সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে নতুন ১৯ নং অনুচ্ছেদ সংযোজন করে। যার মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে এ সংশোধনী গৃহীত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক সরকার কর্তৃক ঘোষিত সব ফরমান, আদেশ, প্রধান সামরিক প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, নির্দেশ, অধ্যাদেশসহ যাবতীয় সরকারি কার্যক্রম অনুমোদন করে এবং এতে আরো বলা হয়, এগুলোর বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না এবং এগুলো বৈধভাবে প্রণীত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হবে। এ সংশোধনীতে আরো বলা হয় যে, সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বরের মধ্যে যেসব নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সেসব নিয়োগ বৈধভাবে প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এ সম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো প্রশ্ন উথাপন করা যাবে না এবং কোনো ব্যক্তি ওই মেয়াদের মধ্যে ওই ফরমানের অধীনে এমন পদে নিযুক্ত হয়ে থাকলে তিনিই ওই পদে বহাল থাকবেন। এতে আরো বলা হয় যে, ওই মেয়াদের মধ্যে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যেসব পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন সেসব পদ যদি ওই আইন

Dhaka University Institutional Repository

প্রবর্তনের তারিখের পরও বহাল থাকে তা হলে ওই তারিখ হতে সেসব পদে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। এতে আরো বলা হয় যে, এ সংশোধনীর অব্যবহিত আগে বলবৎ সব অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য আইন, ওই ফরমান বাতিল এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারকারী ফরমান সাপেক্ষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত সংশোধিত বা রহিত না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এতে বলা হয়েছে ওই ফরমান বাতিল এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে ১৯৭২ সালের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত ও বহাল হবে এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারের এমন কোনো অধিকার বা সুযোগ পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্বহাল হবে না যা অনুরূপ বাতিল বা প্রত্যাহারের সময় বিদ্যমান ছিল না। এ সংশোধনী আইনের লক্ষ্য ছিল জেনারেল এরশাদের এবং তার সরকার ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব বিধি বিধান ও সামরিক আইন জারি করেছেন এবং ওই সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন সেগুলোর বৈধতা দান করা এবং সবকিছুকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা। এর মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং সংবিধানকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। মূলত: ১৯৮৬ সালে ১১ নভেম্বর সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ সরকারের ৪ বছর ৮ মাসের সামরিক শাসনকে বৈধ করা হলো।[১]

পাদটীকা

১. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, লি., ঢাকা১৯৯১, পৃষ্ঠা-১১৭।

সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী :

১৯৮৮ সলের ২৫ এপ্রিল চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় এবং তা ১১ জুলাই পর্যন্ত চলে। চতুর্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অষ্টম সংশোধনী। ১৯৮৮ সালের ১১ মে অষ্টম সংশোধনী জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। ৭ জুন অষ্টম সংশোধনী বিল সংসদে পাস হয়।[১] রাষ্ট্রপতিও বিলে সম্মতি দান করেন ১৯৮৮ সালের ৯ জুন।[২] অষ্টম সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য সংশোধনী হলো : এ সংশোধনী সংবিধানে ২-ক অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে। এতে বলা হয় যে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম। তবে অন্যান্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া এ সংশোধনী সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, রংপুর ও বরিশাল হাইকোর্টের ৬ টি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। এ সংশোধনীটি সংবিধানের ২, ৩, ৫ এবং ৩০ অনুচ্ছেদও সংশোধন করে। ফলে অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পাল্টিয়ে যায়।[৩]

পাদটীকা

১. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২২৬।

২. ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩৫২।

৩. ডালেম চন্দ্র বর্মণ, "সংবিধান সংশোধনী এবং গণতন্ত্র" সমাজ নিরীক্ষণ / ৪২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-৩৯।

সংবিধানের নবম সংশোধনী :

১৯৮৯ সালের ২২ মে চতুর্থ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় এবং তা ১০ জুলাই পর্যন্ত চলে। সংবিধানের নবম সংশোধনীটি চতুর্থ জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসের ১০ তারিখে গৃহীত হয় এবং ১১ জুলাই রাষ্ট্রপতি তার সম্মতি প্রদান করেন। এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৭২, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৪৮, ১৫২ পরিবর্তন সাধন এবং চতুর্থ তফসিলে সংবিধানের নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়।[২] অনুচ্ছেদ এবং চতুর্থ তফসিল সংশোধন করা হয়। এটি সংবিধানে ৫৫- ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে। এ সংশোধনীতে প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় যে, উপরাষ্ট্রপতি বরাবরে স্বাক্ষরযুক্তপত্রে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকা পর্যন্ত অনুরূপ সংসদ সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না। আবার কোনো সংসদ সদস্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে প্রেসিডেন্ট কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। তাতে রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ ৫ বছর নির্ধারণ করা হয়।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. ড. এমএ ওয়াজেদ মিঞা - প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫২

২. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৮।

৩. জালাল ফিরোজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৭-২৬১।

সংবিধানের দশম সংশোধনী :

১৯৯০ সালের ৩ জুন চতুর্থ জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশন শুরু হয় এবং এ অধিবেশন ১ আগস্ট পর্যন্ত চলে। সংবিধানের দশম সংশোধনীটি ১২ জুন (১৯৯০) গৃহীত হয় এবং ২৩ জুন রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাতে সম্মতি প্রদান করেন। এ সংশোধনীতে সংসদে মহিলাদের আসন সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত করা হয়। সংশোধনীতে আরো বলা হয়, সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩৯টি আসন আরো ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।[১] উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানে ১০ বছরের জন্য সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৭৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত সংবিধানের দ্বিতীয় ঘোষণা (১৫তম সংশোধনী) আদেশে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ১৫টি আসনের পরিবর্তে ৩০টি আসন নির্ধারিত হয় এবং তা ১০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছরকাল সুনির্দিষ্ট করা হয়।[২] এছাড়া সংবিধানে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিবিধানে যে অসঙ্গতি বিদ্যমান ছিল এ সংশোধনী আইনে তার নিরসন ঘটলো এ আইনে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হবার ১৮০ দিনের (৬ মাসের) মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হবে।[৩] বিরোধী দলীয় সদস্যরা বিলটির প্রতিবাদে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করেন।[৪] এভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরশাদ বেসামরিকীকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখে তার দীর্ঘ ৯ বছরের শাসনকে বৈধতা দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়।

পাদটীকা

১. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা-১১ জুন, ১৯৯০।

২. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-২০৭-২৬১, ২৫৩-২৫৬ ও দেখুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১১৫-১১৬।

৪. The Bangladesh Observer, Dhaka, 13 June-1990.

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাই ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করে তার সামরিক শাসনকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেসামরিকীকরণ করার প্রচেষ্টা চালান সক্রিয়ভাবে। এরশাদের এ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামরিকীকরণের চিত্র। যেমন :

২.গ. এরশাদের সামরিকীকরণ:

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২-৯০ সময়কালে রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন এবং রাজনীতি ও আর্থসামাজিক কর্মকান্ড সব কিছু অস্তিত্বশীল ছিল একটা অসাংবিধানিক কনস্টিটুয়েন্সির ওপর। আর এটি হচ্ছে- সামরিক বাহিনী। বাস্তব ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগ থেকে শুরু করে 'ওয়্যারেন্ট অব প্রেসিডেন্স' পর্যন্ত সর্বত্রই সামরিক বাহিনী ছিল প্রথম সর্ব প্রাধান্যশীল ও চূড়ান্ত। ১৯৮২-৯০ পর্যায়ে সামরিক বাহিনী হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতি, রাষ্ট্র কাঠামো ও সরকারের মৌল নিয়ন্ত্রক। এ সময়ের মধ্যেই সর্বগ্রাসী সামরিকীকরণ করা হয়েছে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করার পর থেকে এ সামরিকীকরণ অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ব্যাপক মাত্রায় শুরু হয়। সরকারের সব ক্ষেত্রে প্রশাসনের সব বিভাগ ও শাখায় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা প্রাক্তন ও বর্তমান উভয়ই ব্যাপক মাত্রায় পদ দখল করতে থাকে। বিষয়টি সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে প্রায় সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। 'কি পোস্ট'সমূহের বিশাল অংশই সামরিক সদস্যদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর থাবার শিকার হয়।

নিজের আসন সংহত করার পরই এরশাদ সরকার মনোযোগ দেন সামরিকায়নে। প্রশাসন পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য ব্রিগেডিয়ার এনামুল হক খানের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন সামরিক বাহিনীর (২ জন লে. কর্নেল ও একজন মেজর)। 'এনাম কমিটি' নামে পরিচিত এ কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/কর্পোরেশন ইত্যাদির ৩ হাজার ২৫৫টি পদ হ্রাস করে ২ হাজার ৮৭৩টি পদের স্বীকৃতি দেয়। 'এনাম কমিটির' কাজ সম্পর্কে সরকারি গেজেটে মন্তব্য করা হয়। জাতি এতে উপকৃত হবে।[১] এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে দ্রুতলয়ে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে আসেন প্রশাসনে। এরশাদ সরকার এভাবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনে সৃষ্টি করেছিলেন নতুন একশ্রেণী যার পরিচিতি হয়ে উঠেছিল 'অব.' নামে। এদের নিয়োগের ব্যাপারে যখন যা নিয়ম তৈরি করা প্রয়োজন তা করা হতো। এরা একদিকে যেমন সেনাবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা পেতেন এবং একই সঙ্গে ভোগ করতেন বেসামরিক প্রশাসনের সুযোগ-সুবিধা। এক হিসাবে জানা যায়, প্রায় ৯০টি বিভিন্ন ধরনের সংস্থার প্রধান পদে এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন অবসরপ্রাপ্তরা।[২] এভাবে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সামরিকীকরণ করা হয়। যেমন :

রাষ্ট্রপতির মন্ত্রণালয় (আপন বিভাগ) এ সামরিকীকরণ :

জেনারেল এরশাদ কর্তৃক সামরিকীকরণের ব্যাপক প্রক্রিয়ার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রথমেই রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অবস্থা তুলে ধরছি। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, সহকারী সচিব, পিএস ও সুপ্রিম কমান্ডার, রাষ্ট্রপতির ৪ জন এডিসি, সর্বাধিনায়কের পিএসও এবং প্রধান সম্বয়কারী এরা সবাই ছিলেন সামরিক অফিসার। এছাড়া ট্রান্সপোর্ট অফিসার, সিনিয়র কম্পান্টোলার, কম্পন্টোলার, সহ কম্পন্টোলার, ট্রান্সপোর্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট, মহিলা মেডিকেল অফিসার (বঙ্গভবন চিকিৎসালয়) এবং সিও পিজি আর-সেনানিবাস (রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্ট) এরা সবাই সামরিক অফিসার ছিলেন। তেজগাঁও পুরনো সংসদ ভবনে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ), প্রাকৃতিক জনসম্পদ ও সমাজ উন্নয়ন অনুবিভাগে মহাপরিচালক এবং জাতীয় নিরাপত্তার সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ সেলে চেয়ারম্যানসহ অতিরিক্ত পরিচালক, যুগ্ম পরিচালক পদে সবাই সামরিক অফিসার ছিলেন।[৩]

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২ জন যুগ্ম সচিব ছিলেন ব্রিগেডিয়ার, ২ জন উপসচিব ছিলেন মেজর, প্রকৌশল উপদেষ্টা ছিলেন একজন লে. কর্নেল। প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংস্থার পরিচালক ছিলেন একজন গ্রুপ ক্যাপ্টেন।[৪] ১৯৮৭ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর সব কর্মকান্ডের ওপর থেকে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বিলোপ করার দৃঢ় পরিকল্পনানুযায়ী 'রুলস অব বিজনেস ১৯৭৫'-এর প্রথম ও তৃতীয় তফসিলসহ অন্যান্য বিধি স্বেচ্ছাচারীভাবে সংশোধন করা হয়।[৫] এভাবে সামরিক রাষ্ট্রপতি জে. এরশাদ সম্পূর্ণরূপে সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীন তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্মকান্ডকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ে ইতিপূর্বেই তিনি ৬টি বিভাগ ও সচিবালয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সুপ্রিম কমান্ড হেড কোয়ার্টার্স ডিভিশন গঠন করার পর এ সংখ্যা ৭-এ দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, এরপর নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ও নিয়ে আসা হয় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে। এভাবে এ সময়ে একাধারে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বেসামরিক ক্ষেত্রে র সামরিকীকরণের অদৃষ্টপূর্ব নজির তৈরি করেন বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক শাসক এরশাদ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিকীকরণ :

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপসচিব (ডিএস) পদে নিযুক্ত ছিলেন একজন মেজর। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ বিভাগে ২৩ জন লেফটেন্যান্ট থেকে মেজর পদমর্যাদার অফিসারকে নিয়োগ করা হয়। ডিআইজি পদে নিযুক্ত হয় ১৪ জন। এদের মধ্যে ৯ জন গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী, ৬ জন আইএ। এসপি পদে নিয়োগ করা হয় ৯ জনকে। এদের মধ্যে ২ জন আইএ পাস, বাকি ৭ জন গ্রাজুয়েট। উল্লেখ্য, এদের সমমর্যাদার অফিসাররা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় (বিসিএস) উত্তীর্ণ হয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ শেষে নিযুক্তি পেতেন পুলিশ প্রশাসনে। এসব সামরিক কর্মকর্তাকে ২ বছর সিনিয়রিটি দেয়া হয়। ফলে কর্মরত বেসামরিক অফিসাররা জুনিয়র হয়ে যান।[৬] আনসার ও ভিডিপি অধিদফতরের মহাপরিচালক ছিলেন একজন মেজর জেনারেল, বাকি ৮ জন কর্মকর্তা ছিলেন ক্যাপ্টেন, মেজর, লে. কর্নেল, কর্নেল ও ব্রিগেডিয়ার, বাকি ২ জন কর্মকর্তা মেজর। কারা পরিদফতরের প্রধান ছিলেন একজন কর্নেল।[৭] ১৯৯০-এর ৩ ডিসেম্বর পুলিশ বিভাগের সদস্যরা দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক গোপন প্রচারপত্র প্রকাশ করে। ওই প্রচারপত্রে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক/গণতন্ত্র মুক্তি পাক'– এ স্লোগান রাখা হয়। এ বিভাগের সামরিকীকরণ প্রসঙ্গে প্রচারপত্রটিতে বলা হয়, গত ৮ বছরে বহু দুর্নীতিবাজ সামরিক কর্মকর্তাকে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ২৩ জন এসপি পূর্বে সামরিক বাহিনীর অফিসার ছিলেন। এছাড়া পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগের জন্য সামরিক বাহিনীর প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। ফলে প্রশাসনের এ গুরুত্বপূর্ণ অংশটি তার স্বাধীন ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছে।[৮]

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামরিকীকরণ ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে মিলিটারি অ্যাটাচির পদে তো স্বাভাবিকভাবেই সামরিক অফিসাররা রয়েছেন। এছাড়া এ সময় দূতাবাসগুলোর অন্যান্য বেসামরিক পদেও সামরিক অফিসাররা দখল করেছে বহুলাংশে। এরশাদ শাসনামলে ৩০ জন

Dhaka University Institutional Repository

অব. কে ঢোকানো হয়েছিল ইউরোপ ও সমৃদ্ধ দেশগুলোতে। এ প্রক্রিয়া নিয়ে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, এরশাদের দুর্বিষহ দুঃশাসনে ৯ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরশাদ কখনো সরাসরি নিজে, কখনো তার অনুগত ৩ জন- এ আর এস দোহা, হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী এবং আনিসুল ইসলাম মাহমুদের সাহায্যে বারবার এ মন্ত্রণালয়কে আক্রমণ করেছে। ক্ষত-বিক্ষত করেছে এর কাঠামো, কর্মদক্ষতা এবং ভাবমূর্তি।[৯] এ সময়ে ১১ জন রাষ্ট্রদূত ছিলেন অব. জেনারেল ও ২ জন অব. ব্রিগেডিয়ার, প্রটোকল প্রধান ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। উচ্চ পদে ছিলেন ১৪ জন অব. মেজর। বিবিসি এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিল, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অন্য সার্ভিসের লোক এনে নিয়োগের ফলে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ফরেন সার্ভিস ক্যাডার অন্তর্ভুক্ত সংখ্যালগিষ্ঠে পরিণত হতে চলেছে।'[১০] ১৯৮২-৯০ পর্যন্ত পররাষ্ট্র দফতর কিভাবে চলতো সে সম্পর্কে একটি পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, 'পররাষ্ট্র দফতরে নিয়োগ ও বদলি ছিল এরশাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। এরশাদ যা বলতেন তাই হতো। এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মিনি ক্যান্টনমেন্ট বলা হতো।' এতে পেশাদার কূটনৈতিকদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল। নিয়ম বহির্ভূতভাবে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হতো।[১১]

বেসামরিক প্রশাসনকে সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে যিনি ছিলেন সোচ্চার তিনি হলেন তৎকালীন বিসিএস (প্রশাসন) মহাসচিব ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, এরশাদ সরকার দীর্ঘদিন তাকে ওএসডি করে রাখেন।[১২]

অ্যাকশন কমিটি ফর সিভিল রুল দাবি জানায়, 'বাংলাদেশ পুলিশসহ বেসামরিক প্রশাসনের সব পদ হতে সামরিক উর্দিওয়ালাদের অপসারণ করতে হবে।'[১৩]

এরশাদ কর্তৃক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিকীকরণের কাঠামোগত অখন্ডতার ওপর আঘাত হেনেছে এবং নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

আমলাতন্ত্রকে সামরিকীকরণ :

আমলা ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। আমলারাই প্রকৃতপক্ষে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলনীতি নির্ধারক। মূলত আমলাদের রাজনীতিতে টেনে আনার প্রক্রিয়া শুরু করেন সামরিক ও স্বৈরশাসকরা। এরশাদ শাসনামল (১৯৮২-১৯৯০) বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের সহযোগী হয়ে কিরূপ পরিগ্রহ করে তা তথ্য-উপাত্তর ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হলো।

এরশাদ সরকার তার ৯ বছরের শাসনামলে আমলাতন্ত্রকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। এ সময় জি-১০ বলে একটি শব্দ শোনা যেত। এ জি-১০ হচ্ছে ১০ জনের একটি গ্রুপ। শীর্ষস্থানীয় আমলাদের সমন্বয়ে এ জি-১০ গঠিত হয়। এরা সরাসরি জে. এরশাদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক ও যোগাযোগ রক্ষা করতো।[১৫] আমলাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি পরিণত হয়েছিল স্বোচ্চার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সেবাদাসে। বিশিষ্ট সাংবাদিক 'নাজিম উদ্দীন মোস্তান' এ সময়ের আমলাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পয়েল সিস্টেমের সঙ্গে তুলনা করে উল্লেখ করেন, বাংলাদেশে এরশাদ সরকার তার শাসনামলে গুপ্ত সংস্থা, সচিবালয়ে কেবিনেট, সরকারি সংস্থা প্রচার মাধ্যম, এমনকি ডাকঘরে পর্যন্ত তার শিখন্ডী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাকে বলা হয় স্পয়েল সিস্টেম।'[১৬] এ আমলাদের নিয়েই স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধীদের দমন, পীড়ন, হত্যা, ভোট ডাকাতির নির্বাচনী প্রহসনমূলক নাটক মঞ্চায়ন, মিডিয়া ক্যু, সব সরকারি আয়-উৎস থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট ও তা বিদেশে পাচার। শত শত কোটি টাকা ব্যয়, প্রচার, প্রপাগান্ডা, ভাড়া করা লোক দিয়ে জনসভার আয়োজন, বছরের পর বছর শিক্ষাঙ্গন বন্ধ রেখে যুব সমাজকে চরম অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়া, ইত্যাকার সব অপকর্ম সাধন করে। ফলে সমাজে মারাত্মক সামাজিক অবক্ষয় নেমে আসে।

আমরা দেখতে পাই ১৯৮৭ সালের 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা'র এক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে 'মিডল ম্যান আমলাতন্ত্রের বিস্তার' শীর্ষক এ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ ছিল– আমলাতন্ত্রের বিস্তার হিসাবে বিকাশ ঘটেছে মিডলম্যানদের আর তাদের মাধ্যমে ১০ কোটি লোকের সম্পদ চলে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। আমলারাই এ দেশের ক্ষমতার মূল উৎস, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের নীতিনির্ধারক। তারা আইন প্রণয়ন করেন আমদানি-রফতানি, শিল্প ও করনীতি এবং নির্ধারণ করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার। ফলে তাদের হাতেই থেকে যায় অর্থনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের ক্ষমতা।[১৭] আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভয়াবহতা (৮২-৯০) এ সময়ে বাংলাদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে।

সামরিক বাহিনী :

সামরিক বাহিনী যে কোনো দেশের গর্ব ও গৌরবের বস্তু। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে তারা জড়িত। দেশের ক্ষমতা ও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সেনাবাহিনীকে জড়িত করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। এতে সামরিক বাহিনীর ভাবমূর্তিই শুধু ক্ষুণ্ন হয় না। দেশ রক্ষার মতো পবিত্র দায়িত্ববোধেরও অবমাননা করা হয়। অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস বলে বহু দলীয় সমাজ ব্যবস্থায় রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রবেশ এবং আগমন পরিস্থিতির উন্নতির চেয়ে অবনতি ঘটায়। উপরন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থায় রাজনীতি একান্তই বিতর্কমূলক। অতএব রাজনীতিতে/প্রশাসনে অংশগ্রহণ করলে সামরিকবাহিনী একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যা তার পক্ষপাত শূন্য ভাবমূর্তি, পেশা ও কাঠামোগত শৃঙ্খলা এবং ঐক্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী প্রবেশ করলে রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করে এবং অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। উপরন্তু রাজনৈতিক বিতর্কে অবতীর্ণ হলে সামরিক বাহিনী সে তার জাতীয় ঐক্য প্রতীকের চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং রাজনীতির খেলার নিয়মানুযায়ী সে তার সমালোচনার উর্ধ্বে থাকার দাবিদার থাকে না। এটি সামরিক বাহিনীর জন্য শুভ ও সুখপ্রদ ব্যাপার নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) এ সময়ে ঠিক এমনটি ঘটছে। এ পর্যায়ে রাজনীতির সঙ্গে সামরিক বাহিনী যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে একটি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ফেলে দেয়। ৮২-৯০ এ দশকের পুরো সময়টাতেই সামরিক বাহিনী ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষাভাবে নিজেদের জড়িত রাখে। এতে ভাবমূর্তির মাপকাঠিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সামরিক বাহিনী। অবশ্য শেষ পর্যায়ে আন্দোলনে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের সামরিক বাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৮২ সালের সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করার পর প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্ব ক্ষেত্রে ই সামরিক বাহিনী জড়িয়ে পড়েছে। আর এ বিষয়টি গুণগতভাবে নতুন মাত্রা ও চরিত্র অর্জন করেছে। সামরিক সরকার রাজনৈতিক নেতৃত্বের বদলে রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা একটি সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

আমলাতন্ত্রের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো জটিল বিষয়ে মন্ত্রী সভা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি এ সময়কালে। তা ১৯৮৬-এর জাতীয় সংসদ বাতিলই হোক, আর বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলন মোকাবিলা করাই হোক। যেমন : ১৯৮৪ সালের ১৫ অক্টোবর, ৩ জোটের সমাবেশ ছিল ঢাকায়। এসব মহাসমাবেশে লাখ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল বেশ ঘোলাটে। জেনারেল এরশাদ পরের দিনই বৈঠকে বসলেন সামরিক উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে। এ বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।[১৮]

এই সময়ে সামরিক বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনে ঢুকে পড়েছিল বেশ ভালোভাবেই। ফলে কাঠামোগত পরিবর্তন ও ভাঙন দেখা দিয়েছিল সর্বত্র। এ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল পুঁজির বিকাশে, প্রশাসনে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ১৯৮২-এর সামরিক শাসন জারীর পর প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি গঠন করা হয়েছিল, একজন ব্রিগেডিয়ারের নেতৃত্বে। এই কমিটি প্রশাসনে লোকবল কমানোর প্রস্তাব দিয়েছিল, যা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত ও হয়েছিল।[১৯] শুধুমাত্র প্রসাশনের অংশীদারিত্ব নয়, স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বেসামরিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে এবং সেই সূত্রে রাজনীতিতে অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। মোট ১৩টি বেসামরিক নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠানে সামরিক বাহিনীর অংশীদারিত্বের বিষয় বিবেচনাধীন ছিল সরকারের। এ ১৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জাতীয় সংসদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (এই, ই, সি) রয়েছে। এর পেছনে 'সরকারি বিরোধী দল' জাসদ (রব) যে যুক্তি দিয়েছিল তা হচ্ছে সামরিক বাহিনী একটি বড় সামাজিক শক্তি। পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, এইসব প্রতিষ্ঠানে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে প্রথমে মনোনয়নের মাধ্যমে, পরবর্তী সময়ে সামরিক বাহিনীর মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে কে কোন প্রতিষ্ঠানে যাবেন।[২০]

১৯৮২-'৯০-এ দীর্ঘ সময়ে একজন জনসমর্থনহীন এবং জনবিচ্ছিন্ন সরকার ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে যে সরকার অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং এ ধরনের দুর্বলতা নিয়ে কোনো সরকারই বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারে না। কিন্তু এরশাদ সরকার টিকে ছিলেন। কারণ তাঁর ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল ক্যান্টনমেন্টের সামরিকবাহিনীর শক্তির উপর। জেনারেল এরশাদ ভালো করেই জানতেন বাংলাদেশে ক্ষমতার ভাঙ্গা গড়ায় সেনাবাহিনীই হচ্ছে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। সুতরাং সেনাবাহিনী যতদিন পর্যন্ত তাকে ক্ষমতায় থাকতে

Dhaka University Institutional Repository

দেবে ততদিন তিনি নিরাপদেই দেশ চালাতে পারবেন। এই ভাবে বাংলাদেশের একমাত্র জনসমর্থনহীন এবং জনবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রপতি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার গৌরব অর্জন করে ছিলেন সামরিক বাহিনীর সমর্থনের উপর ভিত্তি করে। ঠিক তেমনি সামরিক বাহিনী ও নিজেদের হীন স্বার্থে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকারকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতার টিকে থাকাতে সাহায্য করেছিলেন।

আবদুল গাফফার চৌধুরী লন্ডনের "হিলটন হোস্টেলের" "প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে" জেনারেল এরশাদের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন-তাঁর আগে বাংলাদেশের দু'দুজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি কি তাঁর নিজের জন্য এ ধরনের কোনো পরিণতির আশঙ্কা করেছেন না? তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, না তিনি এ ধরনের কোনো পরিণতির আশঙ্কা করেন না, কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, দেখুন আমি নিজের একক ইচ্ছায় ক্ষমতায় আসিনি, আবার একক ইচ্ছায় ক্ষমতায় থাকতেও চাই না। আমি তাই রোজ একবার সিনিয়র আর্মি অফিসারদের ডাকি। জিজ্ঞেস করি তাদের কারো মনে প্রেসিডেন্ট পদে বসার ইচ্ছা জেগেছে কি না ? জাগলে আমাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে বলেন। আমি তক্ষুনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবো। ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য আমাকে এবং আমার ছেলেকে ও স্ত্রীকে যেন হত্যা করা না হয়।[২১]

জেনারেল এরশাদের এ সাক্ষাতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি বাংলাদেশের ডিকটেটর ছিলেন, কিন্তু একক ডিকটেটর ছিলেন না। তিনি ছিলেন কর্পোরেট ডিকটেটর। কিন্তু গণআন্দোলনের চাপে সামরিক বাহিনী যখন দেখতে পেলো এরশাদ সরকারকে দিয়ে আর চলছে না তখন তাদের সমর্থন শেষ পর্যায়ে প্রত্যাহৃত হলো। তবে সেনাবাহিনী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল। এ ব্যাপারে ঢাকার একটি সাপ্তাহিক 'এরশাদের পতনের আগে ক্যান্টনমেন্টে যা ঘটেছিল' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ১ ডিসেম্বর '৯০ সকালে সেনা প্রধান দেশে ফেরত আসেন এবং অনতিবিলম্বে তিনি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সেনা প্রধানের নির্দেশে ঢাকাসহ দেশের সব এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়। এ মূল্যায়নে প্রকাশ পায় যে, জরুরি অবস্থা ও কারফিউ জারি এবং সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা সত্ত্বেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু সেনাবাহিনী ইউনিটগুলো বিভিন্ন নগরীতে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিল। সেহেতু তারা নিজেরাই স্বচক্ষে আন্দোলনকারী জনগণের সক্রিয়তা ও তার ব্যাপ্তি অনুধাবন করতে পেরেছে। সচরাচর যেসব কাজ পুলিশ বাহিনী করে ওই সব কাজ করাও সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। এতে আন্দোলনকারী জনগনের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে একটি পারস্পরিক মুখোমুখি সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এ নাজুক পরিস্থিতি হতে সেনাবাহিনীকে বিচ্যুত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ৩ ও ৪ ডিসেম্বর তিন বাহিনীর প্রধান তাদের পদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিস্থিতি যে দিকে এগিয়ে গেছে, তাতে জনগণ ও জেনারেল এরশাদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য।[২৩] বিবিসি প্রচারিত এক সংবাদ ভাষ্যে বলা হয়, 'শেষ পর্যায়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এরশাদকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, জনমতের বিরুদ্ধে তাহারা আর ব্যবহৃত হইতে রাজি নন। আর তখনই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।'[২৪]

তবে এরশাদের পতনকে তরান্বিত করতে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। গণআন্দোলনের সময় এবং তার পরবর্তী পর্যায় জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবস্থান ছিল সম্মানজনক।

জেনারেল এরশাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সামরিক বাহিনী তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থকে এক করে ফেলেনি। সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল নূরুদ্দিন খান সমগ্র বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে দেখেছেন। চেয়েছেন তার রাজনৈতিক সমাধান। একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনী অত্যন্ত সঙ্গত কারণে জনগণকে প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।

সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকার এ সময়ে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে সশস্ত্র বাহিনীরসমূহ ক্ষতি সাধিত করেছে। দেশের মানুষের কাছে তাদের ভাবমূর্তিকে প্রবলভাবে বিতর্কিত করে তুলেছে। সেনাবাহিনীকে সেই অতীত থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে। দেশের মানুষের আকাংখার প্রতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে সকল সময়ের জন্য। আমরা এ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে পাই সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জে. নুরুদ্দিন খানের বক্তব্য থেকে। ৬ ডিসেম্বর টেলিভিশনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই গণতন্ত্রের জোয়ার এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

একনায়ক তন্ত্রের পরিবর্তন হয়েছে বিভিন্ন দেশে। আমাদের দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র বাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা করে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সহজ ও ত্বরান্বিত করেছে।[২৫]

বিগত দেড় দশকে দেশে হত্যা, ক্যু এবং অভ্যুত্থানের বহু ঘটনাবলির পর সেনাবাহিনী প্রধানের এ বক্তব্য তাদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। এটা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক গতি ধারায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

জাতীয় নেতৃত্বে দল বিকশিত হয় শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুস্থতাই জাতীয় অগ্রগতির সূচক। অথচ বাংলাদেশে (৮২-৯০) এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ হয় কলুষিত। হয় সন্ত্রাস কবলিত। একের পর এক ধর্মঘট, বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে উন্মুক্ত অস্ত্রের মহড়া এবং দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ, বন্দুক লড়াই, প্রতিদিনকাল রুটিন মাফিক চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে কারণে-অকারণে সামান্য ব্যাপারে একের পর এক বন্ধ ঘোষণা করা হতো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় (ব্যাপারটা বোধহয় এমন রিমোট কন্ট্রোল হাতে কারা যেন নব টিপছে আর ছাত্ররা সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো)। ফলে যথাসময়ে পরীক্ষা হতো না, পিছিয়ে যেতো পরীক্ষা। নষ্ট হতো ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান সময়। লাখো লাখো সাধারণ ছাত্রছাত্রী হতাশার মধ্যে জীবন নিপতিত করতো। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা উদাহরণ নয়, উচ্চ শিক্ষার সব কটি প্রতিষ্ঠানে এ সময় কম-বেশি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

(১৯৮২-৯০) বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোর দিকে তাকালে নিজেদের অপরাধী মনে হয়। অপরাধী মনে হয় এ কারণে যে, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের যে সুমহান ঐতিহ্য আমরা লক্ষ্য করেছি নিছক রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থেও জন্য সেই ছাত্র সমাজকে এই সময়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্বৈরাচারী সরকার কিভাবে ব্যবহার করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখায় নির্মম প্রহসন চালিয়েছিলেন তার সুস্পষ্ট ধরন দেখে।

এটা ঠিক স্বৈরশাসক সব সময়ই চায় ছাত্ররা বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকুক। দেশে কার্যকর কোনো ছাত্র আন্দোলন গড়ে না উঠুক। সন্ত্রাসের কারণে অভিভাবক মহলে ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠুক। যাতে করে ছাত্ররা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সদৃঢ়

Dhaka University Institutional Repository

কোনো অবস্থান গ্রহণ করতে না পারে এবং সেই সুযোগে স্বৈরাচারী সরকার তার শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের ভীতকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

সামরিক ও স্বৈরশাসক এরশাদ ১৪ ফেব্রুয়ারির পর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। এরশাদ বিশ্বাস করতেন সবাইকে কেনা যায়। কিনেছেন ও অনেককে তিনি। বহু ব্যক্তি-ছাত্রকে কিনেছেন। কাছাকাছি গিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। শুধু চেয়েছেন ছাত্র সংগঠনগুলো যেন ঐক্যবদ্ধ না হয়। এজন্য ব্যক্তি-শিক্ষকের সেবা ও গ্রহণ করেছেন। ছাত্র সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তিদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। শুধু চেয়েছেন ছাত্র শক্তিকে শতধা বিভক্ত রেখে নিজেদের সীমানায় বন্দি রাখতে।

এ কৌশলে ভালো ফল ও ফলেছে বেশ কিছু দিন। বিভক্ত হয়ে ছাত্ররা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেছে। নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়েছে। ফলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য হয়ে এসেছিল অস্ফুট। ছাত্রদের একাংশের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে অর্থ ও সম্পদের সাহায্যে উৎকোচ দিয়ে তাদের মাস্তানে পরিণত করাটা পুরনো কায়দা হলেও ১৯৮২-৯০-এর সময়ে তা রীতিমতো আর্টে পরিণত হয়েছিল।[২৬] বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সরকার থেকে নিজস্ব লোক খুঁজে বের করে তাদের হাতে অর্থ ও অস্ত্র তুলে দেয়া হতো। তাতে লাভ হতো এই যে, নির্দিষ্ট সময় হাঙ্গামা সৃষ্টি করলে ও তার দায় সরকারের ওপর পড়তো না। পড়তো ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের ওপর।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (১৯৮২-৯০) এ সময়ে এরশাদ সরকার সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ছাত্রদের ওপর কি পরিমাণ দমন-পীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছিলেন তার বাস্তব উদাহরণ হিসেবে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অশান্ত পরিবেশের কয়েকটি খন্ড চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

২৪ মার্চ রাতেই ছাত্ররা সামিরক শাসন জারির প্রতিবাদ করলে, পরদিন সকালবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো আক্রান্ত হয়। সামরিক বাহিনীই হলগুলোতে চলে আসে। প্রচন্ড ত্রাস সৃষ্টি করে। সামরিক সরকারের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পোস্টার তোলা হয়। সামরিক বিধিবলে ৫ জনের বেশি একত্রে জমায়েত নিষিদ্ধ করে। এমনকি মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের জন্যও রমনার পুলিশ কন্ট্রোল রুম ও আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকের কার্যালয় থেকে অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেয়।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২-সালের ৭ নভেম্বর উপলক্ষে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক মিছিলের আয়োজন করে। মিছিল চলাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতির কোনো তোয়াক্কা না করেই পুলিশ অকস্মাৎ মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের খন্ড যুদ্ধ। এ সময় মধুর ক্যান্টিনে অবস্থানরত অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা ও পুলিশ প্রতিরোধে এগিয়ে এসে অংশগ্রহণ করে। ক্রমাগত কাঁদানে গ্যাস ও গুলি সমগ্র ক্যাম্পাসকে কাঁপিয়ে তোলে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নুরুল আমিন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মাহমুদা খাতুন নিজেদের কক্ষে বসে টিউটরিয়াল ক্লাস নেয়া অবস্থায় পুলিশ কক্ষে ঢুকে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তাদের লাঞ্ছিত করে। পুলিশ সমগ্র ক্যাম্পাসে ঢুকে শ্রেণী কক্ষের কাচের জানালা ভাঙতে থাকে এবং জানালা ফুটো করে গ্যাসের সেল ক্লাসরত ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর মারতে থাকে।[২৮] এভাবে সমগ্র ক্যাম্পাসে এক বিভীষিকাময় ঘটনার উদ্ভব হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি সামরিক সরকারের এ হস্তক্ষেপকে নজিরবিহীন ও নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করে।[২৯]

এই সময়ে ছাত্রদেরকে ব্যবহার করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ারে। একদিকে রাজনৈতিক দল অন্যদিকে সরকার তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও চাপ প্রয়োগের জন্য যেন এই সময়ে অস্ত্রের ব্যবহার রাজনৈতিকভাবে অনুমোদিত হয়ে গেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেসব দলের প্রভাব আছে সব রাজনৈতিক দল রাজনীতি ক্ষেত্রে এ সময়ে বেশি অস্ত্রের ব্যবহার অনুমোদন করে। এর কারণ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছানোর চেষ্টা, কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের প্রথম সোপান হিসেবে ধরা হয় ছাত্রাবাস ও ইউনিয়ন দখল। এ ক্ষমতা কিসের এবং কোথায় তার উত্তর সহজ। ছাত্রাবাসগুলোতে প্রভাব বিস্তার করা হোক, সেখানে কেবল নিজ দলীয়রাই থাকবে। লক্ষ্য ইউনিয়ন নির্বাচনে জয়লাভ এবং ইউনিয়নের ক্ষমতা দখল। কিভাবে সে জয় আসবে, কিভাবে ক্ষমতা দখলে আসবে, সে প্রশ্ন অবান্তর। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা দখল। সেই ক্ষমতা কলেজগুলো থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হবে সরকার পক্ষের শক্তি বা বিপক্ষের শক্তির ঘাঁটি। অর্থাৎ জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের অন্যতম ঘাঁটি হয়েছিল বিদ্যাপীঠ গুলো। এভাবে বিভিন্ন মহল নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের ব্যবহার করেছে। তবে শিক্ষাঙ্গনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল অস্ত্র। গোড়া থেকেই এক শ্রেণীর তরুণের হাতে অস্ত্র ছিল। পরে আরো অস্ত্র ও অর্থের জোগান দিয়েছে সরকারের একটি বিশেষ এজেন্সি। ফলে বিভিন্ন ছাত্র দলের ছদ্মাবরণে থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্ত্রের মহড়া চলতো। যার জের হিসেবে ছাত্র সংগঠনের ২টি দলের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে বন্ধুক লড়াই নিত্যদিনের চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুক লড়াই এবং হল দখলের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

১৯৮৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সরকার সমর্থক নতুন ছাত্র সমাজের অস্ত্রধারীদের সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রাবাস থেকে বিতাড়িত করলে ক্যাম্পাসে কিছু সময়ের জন্য শান্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু ৮৬-এর মে-জুন মাসে বিরোধী জোটের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসগুলো দখলে এনে শক্তি ও প্রভাব বিস্তারের জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে। ২৫ জুন (৮৭) এ ২ দলের সংঘর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ছাত্রাবাসগুলো লেবানন নগরীতে পরিণত হয়। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ১৯৮-৮৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ৩১৮টি সংঘর্ষ হয়েছে। এই একই সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে বিরোধের ফলে ১১টি ছাত্রাবাস ভস্মীভূত হয়েছে। ছাত্রাবাসের ২১টি কক্ষ পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে। ১৪২টি বাস, মিনিবাস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে ছাত্র সংগঠনগুলোর আন্তঃবিরোধের সংঘর্ষে অস্থির হতে থাকে ক্যাম্পাস। প্রতিদিনই ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন উপদল একে অপরের বিরদ্ধে গুলি, বোমাবাজি চালাতে থাকে। বিভিন্ন উপদলের লাগাতার সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিভীষিকা নেমে আসে। সুস্থ রাজনীতি চর্চার চেয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রবণতা ক্রমশ:ই বাড়তে থাকে। ছাত্র সংগঠনগুলো সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকে কখন প্রতিপক্ষের দুর্বল জায়গায় পাওয়া যাবে।

এ সময় ছাত্রাবাসগুলো থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে স্মরণকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। এক পরিসখ্যান থেকে দেখা যায়, ৮৬-৯০-এর ৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলোতে ৩০ বার তল্লাশি হয়েছে। তবু ও বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্র ও সন্ত্রাস মুক্ত হয়নি। ১৯৮৫ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে ৯০-এর ৬ অক্টোবর পর্যন্ত এ তল্লাশি অভিযানগুলো চালানো হয়।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও খোলা আকার খতিয়ান

শিক্ষাবর্ষ (জুলাই-জুন)	অনির্ধারিত বন্ধ	মোট বন্ধ নির্ধারিত বন্ধ+নির্ধারিত ছুটি	শিক্ষা দিবস হয়েছে	শিক্ষা দিবস হওয়ার কথা
১৯৮০-৮১	১৭ দিন ছাত্র ধর্মঘট ২৬ সরকার বন্ধ	১১৯	১৭০	২১৩
১৯৮১-৮২	১০ ছাত্র ধর্মঘট ৯০ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৬৮	১৯৭	২০৭
১৯৮২-৮৩	১১ দিন ছাত্র ধর্মঘট ৩৩ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	২১৮	১৪৭	২২৪
১৯৮৩-৮৪	১১ দিন ছাত্র ধর্মঘট ১২২ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৯৬	১৬৯	১৯৯
১৯৮৪-৮৫	১৭ দিন ছাত্র ধর্মঘট ১৬ দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	২৬৫	১০০	১৮৯
১৯৮৫-৮৬	৫০ দিন ছাত্র শিক্ষক ধর্মঘট ৩৫ দিন সরকার কর্তৃক	১৯২	১৭৩	২০৬
১৯৮৬-৮৭	২৩ দিন ছাত্র ধর্মঘট ৬৪দিন সরকার কর্তৃক বন্ধ	১৯১	১৭৪	২৪৪
১৯৮৭-৮৮	১৩ দিন ছাত্র ধর্মঘট	১২২	১৮৫	১২৭

তথ্য সূত্র : সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৪ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ক্যাম্পাসে মিছিল, মিটিং চলাকালে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর ৪ বছরে অন্তত : ১৫ বার সশস্ত্র হামলা সংঘটিত হয়। সংঘর্ষ ঘটেছে ২০ বার। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন রাস্তায় যান বাহনে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে ২০ বার। ৮ বার ঘটেছে অগ্নিসংযোগের ঘটনা। প্রকাশ্যে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ২৫ বার। এ সময়ের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে প্রায় ৫০০ ককটেল ও হাতবোমা।[৩১] সংবাদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারের দেয়া এক ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন ছাত্রনেতা বলেন, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশি অভিযানের মধ্যে দিয়ে আবারো প্রমাণিত হলো অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা ক্যাম্পাসে কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের ছাত্রছায়ার থাকে। এসব সংগঠন অস্ত্রধারীদের প্রশ্রয় দিয়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করেছে এবং সরকার এর সুযোগ নিচ্ছে।[৩২] ১৫ অক্টোবর (১৯৯০) যখন-তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার অধিকার সম্পর্কিত একটি অধ্যাদেশ সরকার জারি করেন। সমগ্র শিক্ষিত সচেতন মহল সরকারের এ পদক্ষেপের নিন্দা করে। ঊর্ধ্বতন সরকারি ও রাজনীতিবিদদের বেশির ভাগ সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে বলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দিনের পর দিন এভাবে বন্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের অবস্থা সম্পর্কে কারো কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো এমনটি একটা অবস্থানে মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে থাকে। আর সুযোগ নিয়ে এরশাদ সরকার জোরপূর্বক ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চরম আঘাত হানে। জরুরি অবস্থা, কারফিউ জারি করে যখন-তখন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও স্কুল বন্ধ করে দেয়। পাইকারি হারে ছাত্রদের গ্রেফতার ও দমননীতি চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র মাস্তান ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের ক্ষেত্রে পরিণত করে।

ফলে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুস্থ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক ও স্বৈরাচারী সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ সময়ে যে জঘন্যতম বর্বরতা ও নৃশংসতা চালিয়েছিল সমস্ত বিবেকবান মানুষের হৃদয়ে তাতে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন:

নির্বাচন পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় সেই নির্বাচন পদ্ধতি জেনারেল এরশাদের সামরিক ও স্বৈরাচারী শক্তির প্রয়োগে বাংলাদেশ (১৯৮২-৯০) সময়ে পরিণত হয়েছিল এক প্রহসন ও তামাশার প্রতিষ্ঠান হিসেবে। নির্বাচন প্রথাকে এমনভাবে বিনষ্ট করা হয়েছিল যে, সিভিল সমাজের সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে যায় নির্বাচন থেকে এবং তারা নির্ভর করে সামরিক আমলাতন্ত্রের ওপর। বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) সময়ে নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে সামরিক শাসনের অধীনে এবং স্বৈরাচারী কায়দায়। এ সময়ের ভেতরে যে কয়টা নির্বাচন হয়েছে প্রত্যেকটির চেহারা একই। ভোটার না থাকলেও চলবে। ব্যালট বাক্স ভরলেই হলো। পছন্দমতো ব্যক্তিরা নির্বাচিত হবেনই। সরকার বিভিন্ন নির্বাচনে অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তারপূর্বক ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে ঘোষণার ব্যবস্থা করে। পেশিশক্তি ও অর্থবলের অশুভ প্রভাবের জন্য এ সময়ের নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থা ছিল না। এরশাদ সরকার তার নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন ব্যবস্থা দুমড়ে-মুচড়ে যেভাবে জনগণের কাছে অর্থহীন করে তুলেছিল তাতে জনগণ রাজনীতি বিমুখ হয়েছিল। এ সময়ে নির্বাচনে প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ না করায় এবং সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী সাজানো নির্বাচন করাতে দেশ-বিদেশে এ নির্বাচনের কোনো মূল্য ছিল না। ভোট কেন্দ্রে যাওয়া এবং ভোট দেয়ার প্রতি জনসাধারণ হারিয়ে ফেলেছিল আগ্রহ। মূলত এরশাদ শাসনামলের সব নির্বাচনই তার সামরিক ও স্বৈরাচারী শক্তি প্রয়োগে প্রহসনের নির্বাচন। যার পেছনে কোনো গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ও কোনো বৈধতা ছিল না।

বিচার বিভাগ :

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা যে কোনো ন্যায়নিষ্ঠ এবং গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান শর্ত। দেশে আইনের শাসন না থাকলে গণতন্ত্রের দাবি বা প্রতিষ্ঠা ২টি সমানভাবে মূল্যহীন। অথচ ৮২-৯০ সময়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিচার বিভাগ। ক্ষত-বিক্ষত হয় বিচার বিভাগীয় স্বতন্ত্র। স্বাধীন বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে জনগণকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছিল। এরশাদ সরকার স্বাধীন বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে তাকে বিকৃত করে। এ বিকৃতি সাধন করা হয় নানাভাবে। প্রথমত, হাইকোর্টকে বিভক্ত করে জনগণের দোরগোড়ায় বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়ার নাম করে গৃহীত পদক্ষেপ। সামরিক ফরমানের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে তিনি প্রথমে ৩টি, পরে আরো ৩টি স্থায়ী হাইকোর্ট বেঞ্চ স্থাপন করেন বিচার বিভাগ বিকেন্দ্রীকরণের নামে। এর ফলে হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টের একক সত্তা হিসেবে না থেকে পৃথক সত্তায় রূপান্তরিত হয় সামরিক শাসনের মাধ্যমে। বিচারক নিয়োগের ব্যাপারটি রাষ্ট্রপতির হাতে রাখা হয়। বিচারকদের বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে পূর্বের আইন বাতিল করে। বিভিন্নভাবে বিচার বিভাগের ওপর সামরিক সরকার তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম রেখেছে (১৯৮২-৯০) পর্যন্ত।

সংবাদপত্র :

১৯৮২-৯০ সময়ে এরশাদ সরকারের আমলে মৌলিক অধিকার খর্বকারী বিশেষ ক্ষমতা আইনটি গোটা সংবাদপত্র শিল্পের মাথার ওপর ডেমোক্লিসের খড়্গের মতো ঝুলে ছিল। এ আইনের বলে যে কোনো সময় যে কোনো সংবাদপত্রকে এমনকি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হতো। এরশাদ শসনামলে বন্ধ সংবাদপত্রের তালিকায় রয়েছে দৈনিক খবর, দৈনিক বাংলার বাণী, সাপ্তাহিক দেশবন্ধু, প্রহর, যায়যায়দিন, বিচিত্রা ও আরো কিছু সাময়িকী। বন্ধ সংবাদপত্রের দীর্ঘ তালিকা প্রমাণ করে সামরিক সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের মাত্রা।[৩৩] বিদ্যমান জরুরি অবস্থা, বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে আরোপিত সরকারি বিধি-নিষেধে দুয়ের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রগুলোকে এ সময় চলতে হতো অত্যন্ত সন্তর্পণে। একটু এদিক-ওদিক হলেই নেমে আসতো পত্রিকা বন্ধের নোটিশ। ফলে সংবাদপত্রের জগৎ পরিণত হয়েছিল এক দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে।

সংস্কৃতি :

এরশাদের সামরিক জাঁতাকলের (১৯৮২-৯০) সময়ে ভয়ঙ্করভাবে দলিত-মথিত হয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। দুর্নীতি ও অরুচির কবলে পড়ে দেশের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো। এরশাদ সরকার দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংস করে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে অনুপ্রবেশ ঘটানোর পাঁয়তারা করে আসছিল ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই। সংস্কৃতিসেবী হিসেবে নিজেকে ও তার সরকারকে পরিচিত করে তুলতে চেয়েছিল। এ কারণে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে একদল বুদ্ধিজীবী ক্রয় করেছিলেন এশীয় কবিতা উৎসব করতে। দৈনিক পত্রিকায় প্রথম পাতায় পর্যন্ত তার কবিতা ছাপা হয়েছিল। তারই চরম পদক্ষেপ হিসেবে গঠন করা হয় 'সংস্কৃতি কমিশন'। দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মীয় ভাবধারা ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে এ কমিশন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাদের প্রায় কোনো স্থান

Dhaka University Institutional Repository

নেই। তারাই হয়েছিল এর সদস্য। বাংলা একাডেমী ও এশিয়াটিক সোসাইটির ক্ষেত্রে যে ২টি সুপারিশ করা হয়েছে তা তার স্বাক্ষরের পর মুক্ত করা হয়েছে।[৩৪] দেশের সব পর্যায়ের সংস্কৃতিবান মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে সংস্কৃতি কমিশন এবং সংস্কৃতি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ করেছেন। এরশাদ সংস্কৃতির পাশাপাশি ধর্মীয় রীতি-নীতি ও অনুশাসন নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টাও চালান তার শাসনামলে।

এরশাদ সরকার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যাদের নিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশ ছিলেন আমলা। ক্ষমতাসীনদের প্রতি বিশ্বস্ততার কারণে এদের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বসানো হয়েছিল। কিভাবে এরশাদ সরকার জনমত বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন তা বোঝা যাবে ১৯৮৮ সালে পেশকৃত সংস্কৃতি কমিশন রিপোর্টে। এ রিপোর্টের প্রধান ২ জন উদ্যোক্তা হলেন ভাষা আন্দোলন বিরোধী ও প্রতিটি সামরিক সরকারের সমর্থক সৈয়দ আলী আহসান। আর উচ্চাকাঙ্খী একজন আমলা ড. এনামুল হক।[৩৫]

পাদটীকা

১. Governmrnt of Bangladesh, Tables of Organization and Eqripmrnt: Ministries, Constitutional Bodies, Comissions etc. Dhaka,1982.

২. সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তালিকা, ১৯৯০।

৩. হাসান উজ্জামান, বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণে, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১০১।

৪. হাসান উজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০২।

449222

৫. একতা ১৫-৮-১৯৮৯।

৬. হাসানুজ্জামান, সামরিক রাজনীতির চালচিত্র ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৩-২৯।

৭. ওই পৃষ্ঠা-৩৪-৩৭।

৮. গোপন সার্কুলার নং-১। এ প্রচারপত্রটি ৩ ডিসেম্বর ১৯৯০ তারিখে ঢাকা মহানগরীতে জনগণের কাছে বিলি করা হয়।

৯. সংবাদ; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক অজানা কাহিনী, ৩-১-১৯৯১।

১০. একতা ৮-৫-১৯৮।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১১. পূর্বাভাস (সাপ্তাহিক পত্রিকা) ঢাকা, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ৩, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯০।

১২. মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৪৩।

১৩. অ্যাকশন কমিটি যার সিভিল রুল, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হউন ২৭-১০- ১৯৯০।

১৪. একতা ৫-১০-১৯৮৮।

১৫. হাসানউজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২২।

১৬. নাজিমুদ্দিন মোস্তান, 'প্রভুর সঙ্গে বিদায় : বাংলাদেশের স্পয়েল সিস্টেমের প্রবর্তক এরশাদ' ঢাকা, সাপ্তাহিক খবরের কাগজ ২০, ডিসেম্বর-১৯৯০, পৃষ্ঠা-২১।

১৭. মাহমুদ শফিক, মিডম্যান আমলাতন্ত্রের বিস্তার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা আগস্ট ২১, ১৯৮৭।

১৮. ড. গোলাম হোসেন সম্পাদিত, বাংলাদেশ : সরকার ও রাজনীতি, একাডেমিক পাবলিকেশন ঢাকা ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৮৯।

১৯. হাসানুজ্জামান, 'সামরিক শাসন ও বর্তমান রাজনীতি' এশীয় গবেষণা পত্রিকা, ঢাকা, এশীয় গবেষণাকেন্দ্র, গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সময় ৬ মে, ১৯৮৪।

২০. হাসানুজ্জামান 'সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতা ও রাজনীতি, ঢাকা , ধানশীষ প্রকাশনী, প্রথম সকাল ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৫।

২১. আজকের কাগজ, জুন, ১৯৯১।

২২. সাপ্তাহিক ঢাকা, ২ জানুয়ারি, ১৯৯০।

২৩. সাপ্তাহিক আজকের কাগজ, জুন, ১৯৯১।

২৪. দৈনিক আজকের কাগজ, জুন, ১৯৯১।

২৫. ওই।

২৬. এমাজউদ্দিন আহম্মেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪।

২৭. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-১৩৪।

২৮. রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৫।

২৯. মুহম্মদ খুশবু, বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, (এরশাদের সমকাল) স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা , ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ১৪ মার্চ, ১৯৯০।

৩১. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৪ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৪ জানুয়ারি, ১৯৮৯।

৩২. রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩০৪।

৩৩. দৈনিক সংবাদ, ২০ জুন, ১৯৯১।

৩৪. মুনতাসির মামুন, গণআন্দোলনের পটভূমি। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসানাত সম্পাদিত, নব্বইয়ের অভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৯১, পৃষ্ঠা-১২।

৩৫. উদ্ধৃত, মুকিদুল হক, সংস্কৃতি বিনাশী স্বৈরাচার, অভ্যুত্থান, পৃষ্ঠা-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বিরোধী দল :

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত জনসংখ্যা বহুল, ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট অস্থিতিশীল, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর, অনুন্নত বাংলাদেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে গবেষণার মূল বিষয় বিশ্লেষণের নিমিত্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলবিষয়ক আলোচনায় বলতে হয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল প্রথা বিশেষ করে বিরোধী দল ও তার ভূমিকা অপরিহার্য। নিঃসন্দেহে বিষয়টি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত।[১]

মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে রাজনৈতিক দল কি বা এর সংজ্ঞা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের অপরিহার্যতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধী দলের অবস্থান, প্রয়োজনীয়তা ভূমিকা-বিশ্লেষণ আবশ্যক:–

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও (গুরুত্ব) :

আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে- রাজনৈতিক দল। নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে। নির্বাচকমন্ডলী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দল ১৯ শতকে সংগঠিত হয়েছে ব্রিটেনে, ইউরোপে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বস্তুতপক্ষে বর্তমানকালে যে কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য রাজনৈতিক দল আবশ্যক। এডমন্ড বার্ক (Edmond Burke) রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'যখন কোনো জনসমষ্টি কোনো নির্দিষ্ট স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ প্রসারকল্পে একত্রিত হয়, তখন একটি দলের সৃষ্টি হয়।'[২] এ রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলের সদস্যরা একই আদর্শ ও নীতিমালায় বিশ্বাসী এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করে দলের কর্মসূচিকে এবং জাতীয় স্বার্থকে বাস্তবায়িত করা।

আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে জে এ কোরি (J.A. Corry) এবং জে ই হডগেটস (J.E. Hodlgetts) বলেন, 'রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার পরিবর্তন সম্ভব করে। সরকার পরিবর্তনের উপায় হিসেবে সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানকে আর এ ধরনের সামরিক অভ্যুত্থ্যান রোধকল্পে বল প্রয়োগ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে শাসন করার পাল্টা প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

R M Macyver তার গ্রন্থ 'The Modern State'-এ অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন।[৪] বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন ব্যতীত সরকার পরিবর্তনের অন্য কোন শান্তিপূর্ণ বিকল্প নেই।

বেজহট (Bagehot) বলেছেন, দলীয় সরকারই হচ্ছে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৫] উপরোক্ত বক্তব্যের পাশাপাশি লর্ড ব্রাইসের মন্তব্যটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তার মতে, 'Parties are evitable, no free large country has been without them.'[৬]

স্টেনলি রোথম্যান (Stanley Rothman) রাজনৈতিক দলের উদ্ভব সম্পর্কে বলেন, 'Parties emerged as instruments of legitimizing the use of authority...'[৭]

বস্তুত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিগত মতবাদ (Historical Sitution theory) অনুযায়ী ৩টি প্রধান অভ্যন্তরীণ সংকট রাজনৈতিক দলের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে। সে সংকটগুলো হচ্ছে :– ১. শাসক শ্রেণীর বৈধতার সংকট, ২. জাতীয় ভৌগোলিক অখন্ডতা সংকট এবং ৩. শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সংকট।

রাজনৈতিক দলগুলো সব সময়েই কিছুসংখ্যক ব্যক্তির নেতৃত্বে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। রাজনৈতিক দলসহ প্রত্যেক সংগঠনেই নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে এক ধরনের ক্ষমতাগত সম্পর্ক রয়েছে যাকে রবার্ট মিশেলস (Robert Michels) 'গোষ্ঠীতন্ত্রের লৌহবিধি' ('Iron law of Oligarchy') বলে অভিহিত করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক সরকারের বিস্তার ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রধানত : জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়েছে। আর রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই বিশেষ করে জনমত গঠিত হয়, যার ফলে সরকারি নীতি প্রভাবিত হয়।

লওয়েলের মতে, 'জনমতকে সবার সামনে উপস্থাপিত করা এবং জনগণের সমর্থন অর্জনের জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নির্বাচনী কৌশল প্রণয়নই রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ এবং এটাই রাজনৈতিক দলের টিকে থাকার একমাত্র কারণ।'[৮]

Dhaka University Institutional Repository

৩. ক. বিরোধী দল :

সংসদীয় গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ভোটাধিকারের সম্প্রসারণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের ক্রমবিকাশ সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃত হয়। বিরোধী দল গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হলেও আধুনিক বিশ্বে এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য সরকার পদ্ধতি। পশ্চিমা ধাঁচে বা ব্রিটিশ মডেলের অনুকরণে পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোতে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যে শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে আইন পরিষদ বা পার্লামেন্টের কার্যাবলির জন্য জবাবদিহি করতে হয়। তাকেই সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির সরকার বলে। এ ব্যবস্থায় বিরোধী দল সরকারিভাবে স্বীকৃত। এ ব্যবস্থায় একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন যেমন- ব্রিটেনের রানী বা ভারতের প্রেসিডেন্ট। আইন সভা নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল, গঠন করবে সরকার এবং আইনসভার সমর্থনের ওপর নির্ভর করবে। এ পদ্ধতিতে সরকার জনসমর্থন বা আস্থা হারালে জোরপূর্বক দেশ শাসন করতে পারে না। সেজন্য অত্যন্ত সতর্কভাবে ক্ষমতাশীল দলকে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। মন্ত্রিসভা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আইন সভার কাছে দায়ী। সুতরাং সংসদীয় ব্যবস্থায় আমরা যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অস্তিত্ব দেখতে পাই তাহলো : ক. পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব, খ. কেবিনেটের দায়িত্বশীলতা, গ. আইনের শাসন, ঘ. স্বীকৃত বিরোধী দল এবং ঙ. শাসন ও আইন বিভাগের পারস্পরিক সমন্বয়ের সম্পর্ক।[৯]

এখানে প্রতীয়মান হলো যে, সংসদীয় ব্যবস্থায় যেমন একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান থাকে কার্যকরভাবে। কিন্তু স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দলকে কাজ করতে দেয়া হয় না। অবশ্য প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনো বেরোধী দলের ব্যবস্থা দেখা যায়নি। হিটলারের জার্মানিতে বা মুসোলিনীর ইতালিতে কোনো স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দল ছিল না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও বিরোধী দল বলে কিছু ছিল না। বস্তুতপক্ষে সমাজতন্ত্রে কমিউনিস্ট পার্টিই রাষ্ট্রের প্রধান চালিকাশক্তি। (The Communist party is the

Dhaka University Institutional Repository

driving boree... It is the dictatorship not realy of the proletariat and over all groues in soviet Society.[১০]

আমরা জানি, বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই একাধিক দল থাকে এবং ওই ধরনের রাষ্ট্রে বিরোধী দল সরকারি যন্ত্রেরই একটি অংশ বিশেষ হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত। ব্রিটেনে বা কানাডায় বিরোধী দলের নেতা বা নেত্রী বা উপনেতা সরকারিভাবে স্বীকৃত এবং বেতন ভাতা ও সরকার প্রদত্ত অন্য সব সুবিধা ভোগকারী কর্মকর্তা।

ডুভারজার (Duverger) উল্লেখ করেছেন, 'গ্রেট ব্রিটেনে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্র কর্তৃক বেতন প্রদানের পাশাপাশি মহামান্য রানীর বিরোধী দলীয় নেতাকে সরকারি উপাধি প্রদান করে প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দলকে সরকারের অংশ হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে।'[১১] সুতরাং একথা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না যে বিরোধী দল সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ। বিরোধী দলকে ব্রিটেনের হাউস অব কমন্সের একটি অংশ হিসেবে ধরা হয়। এ ব্যবস্থায় আজকের বিরোধী দল আগামীতে সরকার গঠন করার যে সুযোগ ভোগ করে– সে সুযোগ একনায়কতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেই। তবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্টির অভ্যন্তরে নেতৃত্ব গঠনে ভোটের সুযোগ রাখা হয়। The Penguin Dicionary of Politics বিরোধী দলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'Losse association of individuals or Politcal group or Party wishing to change the government and after its Politicy decisions.'

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে বিরোধী দল। অনেক বিজ্ঞ পন্ডিত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চায় সাংবিধানিক বিরোধী দলের ভূমিকার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

Robert Dahl-এর মতে, '...The privilege of an organized opposition to turn to the electorate for their mandate against the government in polls and in legislature has been one of the significant landmarks in the growth and development of democratic institutions.'[13]

Lane I Erson অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'Democracy implies government as well as opposition and thus democracy functions properly when there

Dhaka University Institutional Repository

is enough room for cleaveges to foster space for political differences and oppositions'[১৪]

A.D. Lindsay বলেছেন, 'Good representative system necessitates a strong opposition and that opposition should be a substitute for the government.'[১৫]

মাইকেল কার্টিসের মতে, 'The crucial element in a parliament democracy is the presence of a legal opposition which is not only tolerated but also allowed sometimes to select the subjects for debates which has an impact on the Government decisions.'[১৬]

মূলত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর যেখানে বিজয়ী দলের সরকার গঠনের এবং বিজিত বা বিরোধী দলের সেই সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার স্বীকৃত হবে। এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই একটি জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে যেখানে উভয়েরই ধ্যান-ধারণার মধ্যে এ সত্যটি ক্রিয়াশীল থাকে যে, আজকের সরকারি দল আগামীকালই বিরোধী দলের আসনে এবং বিরোধী দল সরকারি দলের আসনে বসতে পারে।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী মত সহ্য করার মানসিকতা ও মতপার্থক্যই হলো গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি অপরিহার্য গুণ। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ বিরোধী দল শুধু অব্যবহৃতভাবে শাসক দলের কার্যকলাপই পর্যবেক্ষণই করবে না, সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যথাযথভাবে কাজ করছে কি না তাও দেখার দায়িত্ব পালন করবে। কাজেই গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি প্রধান শর্ত আইন সভার ভেতরে ও বাইরে একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দলের গঠনমূলক ভূমিকা পালন। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নততর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোতে যেখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের শক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রয়েছে। সেখানে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই বিরোধী দলের যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের অধিকাংশ জাতি-রাষ্ট্রকেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে প্রচুর প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যার ফলে এ ধরনের কিছু কিছু দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পর্যবসিত হওয়ার মতো ভাগ্যও বরণ করতে হয়েছে। প্রতিকূল আর্থসামাজিক কাঠামো,

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভাজন, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল ও কার্যকর নেতৃত্বের অভাব, কার্যকর সুশীল সমাজের অনুপস্থিতি, সুচতুর ও অভিজ্ঞ আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি, বৈদেশিক শক্তির প্রভাব রাজনীতি প্রভাবিত সেনাবাহিনী এবং রাজনৈতিক নেতাদের অসততা দেশ প্রেমের অভাব, দুর্নীতি পরায়ণতা ও চরম স্বার্থপরতা ইত্যাদি কারণে এসব দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামোর পাশাপাশি দায়িত্বশীল সরকার, দায়িত্বশীল বিরোধী দল, স্থায়িত্বের ও প্রতিষ্ঠার কাজ দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। স্যার আইভর জেনিংস বিরোধী দলের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'তাৎক্ষণিকভাবে বিরোধী দল সরকারের বিকল্প এবং গণঅসন্তোষের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে থাকে। এর কার্যক্রম অনেকাংশে সরকারের ন্যায়ই গুরুত্ববহ। বিরোধী দল না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না। 'মহামান্য' রানীর কাছে বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা সরকারি দলের মতোই।'[১৭] আবার সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর হবে না যদি 'বিরোধী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনকে মেনে নিতে না পারে।'[১৮] পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহনশীলতা না থাকলে সংসদীয় সরকার প্রক্রিয়া ভেঙে যায়।[১৯]

বিরোধী দলের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে হেরল্ড লাস্কি (Harold Laski) বলেছেন, 'The opposition spends its time in revealing the defects of the government Programme.'[২০] বিরোধী দলের সমালোচনার তীব্রতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলকে সংযত ও সতর্কভাবে চলতে বাধ্য করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচারী মনোভাবকে প্রতিহত করে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলোতে রক্ষণশীল দল (Conservative Party) এবং শ্রমিক দলের (Labour Party) ঐকমত্য রয়েছে বলেই ব্রিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়াও যে বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তাহলো, 'The Prime Minister Meets the Convenience of the Leader of the Opposition and the Leader of the Opposition Meets the Convenience of the Government.'[২১] সরকারি দলে যেমন দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হুইপ থাকা প্রয়োজন তেমনি বিরোধী দলেও বিজ্ঞ হুইপ থাকা আবশ্যক। সেই প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যা করে লর্ড ব্রাইসের মন্তব্য হচ্ছে, '...Without the constant presence and activity of the ministerial whip the wheels of government could not go on for a day. Because the ministry would be exposed to the risk of casual defeat...

Dhaka University Institutional Repository

Similarly, the opposition ... finds it necessary to have their whip or whips because it is only thus that they can act as a party.[২২]

গাড স্টোন (Gladstone) বলেছেন, পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের প্রস্তুতির জন্য বিরোধী দলের চিফ হুইপ হাউস অব কমন্সের বাইরের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর মনোযোগী হন।[২৩]

বিরোধী দলকে সুপরিকল্পিত নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কেননা মূলত বিরোধী দলের ভূমিকা শক্তিশালী হয়, কার্যকর হয়, যদি তাদের কর্মসূচিতে সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত বক্তব্য থাকে।[২৪]

পাদটীকা

১. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহম্মদ (সম্পা.), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা , করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯২, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৮৫।

২. Quted in My Ostrogorsky and translated by froderick Democrcy and the Organsation of Political Parties, (New York: Macmillon1902) P-652.

৩. দ্রষ্টব্য, J. A Corry .and J.E. Hodgetts. Democratic Government and Politics, Third Edition Toronto: University of Toronto: Press, 1968, P-231.

৪. দ্রষ্টব্য, R.M. Maciver, The Modern State, (London: Oxford Mniversity Press, 1964), P-399.

৫. Quoted in Harold Laski, Parliamentary Goernment in England. Severth Edition, (London Aller and Uniuerin Ltd.)

৬. Quoted hin Cori J. Friedrich. Constitutional Government and Democracy, (Massadusetts : James Bryce, Modern Democracies (New ed, 1947).

৭. Stanley Rodhman, European Society and Polities, (New York) Bobbs Merrill Co. 1970.

Dhaka University Institutional Repository

৮. A. Lourence Loedl, Public Opinion and Popular Government, (New ed. 1926), P-361.

৯. অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহম্মেদ (সম্পা.), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাসঙ্গিক ভাবনা, প্রকাশক , করিম বুক কর্পোরেশন্স, ঢাকা-১৯৯২, পৃষ্ঠা-৮৭।

১০. Alex N. Deagnich Manajor European Govermaent. Third Edilion I llinois: Darsey Prwas .1944) P.361

১১. Mearice Duvergex, Political Parties. (London: Mathuen Co. Ltd. 1955) P. 414

১২. Dictionary of Politics, Pergoin Books, 1986, P-243

১৩. Robert A . Dahl, Political Oppsition in Western Democracies, New Haven and London, Yale University Press, 1966. P. Xi-Xix.

১৪. Jan Erik Lone and Sonta, o Wroon, Politics, and Society in Western Europe, Lnodon, Sage- Publications, 1987, P. 10

১৫. A.D.L indsay, The Essntials of Democracy London, Oxford University Press, 1929, P. :43)

১৬. Michal Curtis, Comparative government and Politics, New York, Harper and Row publishers 1978. P-212

১৭. Sir Ivor Jennings . Cabinet Government. Combridge: University Press . 1961) P-16

১৮. H.

১৯. H P. 500.

২০. দ্রষ্টব্য Harold J. Laski Democracy in Crisis (London George Allen & Unein Ltd. 1933) p.32.

২১. Sir Ivor Jennings. op cit. p.500.

২২. Quoted in Carl J. Friedrick.op. Cit.pp. 315-316.

২৩. Ibid...P.316.

২৪. Maurice Duverger .op. cit. p. 415

Dhaka University Institutional Repository

৩.খ . বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা :-

মুজিব সরকারের শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থাও এক্ষেত্রে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতোই। ১৯৭১ সালে যে গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সে গণতন্ত্রের বিধান রেখে ১৯৭২ সালে এদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। ওই সংবিধান অনুযায়ী তখন দেশে ওয়েস্ট মিনিস্টার পদ্ধতির সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ সম্পর্কে মওদুদ আহম্মেদ তার Bangladesh Era of Sheikh Mujibur Rahman.' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'The cause behind the alterationof the entire character of the government was described as materialization of the Pronounced desire of the people of this country to set up a Parliamentary democratic system.'[1]

কিন্তু সেই সময়ের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসকদলের একচ্ছত্র প্রাধান্য ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রারম্ভিক বছরগুলোতে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন ও গণপরিষদ গঠন নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলেও ওই সময়ে দেশে কোনো কার্যকর বিরোধী দলই ছিল না। আওয়ামী লীগের সমর্থিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মধ্যে ১৯৬০ এর দশক থেকে বিরাজমান আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে মেজর এম এ জলিল (অবসরপ্রাপ্ত) এর নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠিত হয়। দলের ঘোষণাপত্রে উলেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের মাত্র শতকরা ৮ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে অথচ মোট জাতীয় সম্পদের শতকরা ৮৫ ভাগ দখল করে রেখেছে।[২]

দলটি আবির্ভাবের গোড়া থেকেই আওয়ামী লীগের অব্যাহত বিরোধিতা করতে থাকে এবং ক্ষমতাহীন সরকারের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন সংগঠিত করে।[৩] ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয় ।[৪]

১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৭৮ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তারমধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ছাড়া বাকি দলগুলো বিরোধী দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ওই নির্বাচনে মোট শতকরা ৫৫.৬১ ভাগ ভোট গৃহীত হয়। সংরক্ষিত ১৫টি নারী আসনসহ নির্বাচনের ফলাফল দাঁড়ায় এ রকম : আওয়ামী লীগ ৩০৮, জাসদ ১, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১ ও স্বতন্ত্র ৫।[৫] নির্বাচনের এ ফলাফল ছিল বিরোধী দলগুলোর জন্য খুবই হতাশাব্যঞ্জক। আওয়ামী লীগের এ বিপুল বিজয়ে বিরোধী দলগুলোর অনেক নেতা অভিযোগ করেছিল যে, নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে।[৬] তখনকার অবস্থায় জনগণ আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে দেশের প্রথম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের অপ্রতুল প্রতিনিধিত্বের কারণে শাসক দল কর্তৃক সংসদীয় বিরোধী দলের সরকারি স্বীকৃতি প্রদান সম্ভব না হওয়ায় বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণের সংসদে কার্যকর ভূমিকা পালনের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না।

এ প্রসঙ্গে Lawrence Ziring Zuvi 'Bangladesh from Mujib to Ershad : An Interpretive Study' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'Since the total sterength of the opposition was very Marginal his led the all Leader Sheikh Mujib to assert that as the opposition political partiesfailed to acquire sufficient seats in the House they could not be declared an official opposition in the Jatya Sangsad.'[৭]

তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের একটি মোর্চা গড়ে ওঠে, যেখানে জাসদের আবদুস সাত্তারসহ স্বতন্ত্র দলীয় কয়েকজন সংসদ সদস্যও যোগ দেন। এ বিরোধী দলীয় এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা সংসদীয় প্রক্রিয়ায় ওই সময় কিছু প্রশ্ন ও ইস্যু তুলে ধরেন যা সরকারি দলের ওপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি। সরকার দেশে বিরোধী রাজনীতির ব্যাপারে নিজেকে অসহিষ্ণু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাদের অবাধ কার্যকলাপ অনুমোদন দিতে ব্যর্থ হয়। তদুপরি বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে প্রথম জাতীয় সংসদেও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতাকে অকার্যকর করে ফেলা হয়। দিলারা চৌধুরী তার, 'Constitutional Development in Bngladesh : Streses and Strains' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'The importantance of rule-making power of the first parliament was greatly diminished with the promulgation of presidential ordinaces which were later regularized

Dhaka University Institutional Repository

by the House. Thus in First Jatiya Sangsad, of all the Acts which were passed, 91 were ordinances.'[8]

শাসক দলের এসব অনিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপ সংসদীয় রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং অকার্যকর বিরোধী দল কর্তৃক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওয়াকআউটের মাধ্যমেই তার প্রতিবাদ করা হচ্ছিল। জাতীয় সংসদ আওয়ামী লীগ সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তাকে এ সময় সংসদের বাইরে বিপ্লবী বিরোধী দলগুলোর (যেগুলোর কার্যকলাপ প্রথম থেকেই নিষিদ্ধ ছিল) কাছ থেকে মারাত্মক চ্যালেঞ্জ ও হুমকির সম্মুখীন হতে হয়। সরকার এ সময় ওই দলগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন দমননীতির আশ্রয় নেয়। রওনক জাহান উল্লেখ করেছেন, 'In order to wipeout the armed opposition, the Prime Minister made a number of forceful statements where the branded both the ultra left and ultra right sections and armed extremists as the adversaries of the Bengali nation.'[9]

বিপ্লবী দলগুলোও আত্মগোপনরত অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তীব্রতর করে। কিন্তু ওই দলগুলোর মধ্যে বিরাজমান আদর্শগত মতবিরোধ ও অন্তর্কোন্দলের কারণে তারাও কোনো কার্যকর পাটফর্ম কিংবা বিকল্প রাজনৈতিক ধারা উপহার দিতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ফলে সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ধারণাটিও বিলুপ্ত হয়। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট একটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নৃশংসভাবে নিহত ও ক্ষমতাচ্যুত হন এবং দেশ সামরিক শাসনের অধীনে চলে যায়।

জিয়া সরকারের শাসনামল : (১৯৭৫-১৯৮১)

জিয়াউর রহমানের প্রায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার আমলে প্রবর্তিত বহুদলীয় পদ্ধতির অধীনে বিরোধী দলের রাজনীতি পুনরায় শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। ওই বছরেই রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনৈতিক দলবিধি (Political Parties Regulation or PPR) জারি করা হয়। এ রাজনৈতিক দলবিধির অধীনে রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের সময়কালে একদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো বহু রাজনৈতিক দল গজিয়ে ওঠে। অন্যদিকে বড় দলগুলোর মধ্যেও ভাঙন ও বিভক্তি দেখা দেয়। রওনক জাহান উল্লেখ করেন, 'জিয়া সরকার অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তার জারিকৃত রাজনৈতিক দল বিধিকে রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

দলগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির কাজে লাগায়, যাতে দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রবপের সমর্থন নিশ্চিত করা যায়।'[১০] ওই সময়ের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন প্রধান বিরোধী দলগুলো নানা নিষেধাজ্ঞা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যথাক্রমে ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তৎকালীন জিয়াউর রহমানের সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

মার্কাস ফ্রাঞ্জ তার 'Bangladeshi The first Decade' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ১৯৭৮ সালের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের ৫ সহস্রাধিক কর্মী ও সমর্থক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন।[১১]

প্রধান বিরোধী দলগুলো মূলত জিয়াউর রহমান কর্তৃক জাতীয়তার ধারণা ও ১৯৭২ সালের সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে। সে সঙ্গে তারা রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ জাতীয় সংসদের অকার্যকারিতারও সমালোচনা করতে থাকে। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদে বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয় যার নেতা সরকারিভাবে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। আইন সভার ক্ষমতা ও মর্যাদা বহুলাংশে খর্ব হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দল দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের ৮টি অধিবেশনের সবকটিতেই যোগ দিয়ে সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। সংসদীয় রীতিনীতি অনুসরণের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা সরকারের কাছে জনগণের সমস্যা তুলে ধরার এবং সরকারের সমালোচনা করার চেষ্টা চালায়, কিন্তু সার্বভৌম সংসদ ও মন্ত্রিসভার জবাবদিহিতার অভাবে এবং সর্বোপরি একজন কার্যকর ও ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতির অভাবে বিরোধী দলের এ প্রয়াস খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। এমনকি এ বিরোধী দল জিয়া সরকারকে সামরিক শাসনামলে গৃহীত পদক্ষেপগুলো বৈধ করার কাজে জাতীয় সংসদকে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতেও ব্যর্থ হয়। এভাবে সংসদের মাধ্যমে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় বিরোধী দল ধীরে ধীরে রাজপথে তাদের সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। বিরোধী দল মূলত জিয়া সরকারের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে এ সময় সোচ্চার হয়ে উঠে। তবে জিয়া সরকারের শাসনামলে বিরোধী দলগুলো তাদের নেতৃত্বের সংকট, ভাঙন, আদর্শগত মতপার্থক্য ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি। এক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুবিধা বণ্টনের কৌশল বিরোধী পক্ষের ভাঙন ও অনৈক্যের জন্য মূল ভূমিকা পালন করে। এসব দুর্বলতার কারণে বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

দলের আন্দোলন পর্যাপ্ত জনসমর্থন লাভে ও তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৮১ সালের জিয়া হত্যাকান্ডের পর ওই সালের ১৫ নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও বিরোধী দলগুলো বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি সাত্তারের বিরুদ্ধে একজন সর্বসম্মত প্রার্থী মনোনয়নে কিংবা নিজেদেরকে একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়।

বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের শাসনামল (১৯৮১-১৯৮২) :

১৯৮২ সালের ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬৬ ভাগ ভোট পেয়ে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি আবদুর সাত্তার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু তার শাসনকালজুড়ে সরকার ও সেনাবাহিনীর মধ্যে অব্যাহত দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি ও নানা অস্থিরতা বিদ্যমান থাকে। বিশেষ করে এ সময় সেনাবাহিনীর সাংবিধানিক ভূমিকা পালনের দাবি উত্থাপিত হয়। তার দাবি অনুযায়ী জাতি গঠন ও জাতীয় প্রতিরক্ষা উভয়কেই জাতীয় প্রতিরক্ষার ধারণার মধ্যে সমন্বয় করা উচিত।[১২] কিন্তু মুহম্মদ এ হাকিমের মতে, 'প্রায় সব রাজনৈতিক দলই এরশাদের ওই প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেলও তারা তার বিরুদ্ধে কোনো সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি'।[১৩] যার ফলশ্রুতিতে সেনাবাহিনীর অব্যাহত চাপেরমুখে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ 'শারীরিক অসুস্থতার' কারণ দেখিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচএম এরশাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

পাদটীকা

১. Moudud Ahmed, Bangladesh Era of Sheikh Mujibur Rahman, Dhaka University Press Limited, 1983. P: 7.

২. Talukder Maniruzzaman, The Bangladesh Revolutioin and its Aftermath, Dhaka University Press. Ltd. 1988. P: 167.

৩. Talukder Minirruzzama, প্রাগুক্ত।

৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৬৯।

৫. সূত্র : নির্বাচন কমিশনঃ ১৯৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ড. এম এ ওয়াজেদ মিঞা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-১৬৫।

৭. Laurence Zring, Bangladesh from Mujib to Ershad An Interpritive Study, Dhaka University Press Ltd, 1992. P. 96.

৮. Dilara Choudhury Constitution Development in Bangladesh Streeses and strains, Dhaka UPL, 1995. P: 120.

৯. Rumana Jahan, Banagladesh Political Porblesm and Issues. Dhaka Univesity Press Limited, 1980. P: 79.

১০. Rumana Jahan, প্রাগুক্ত।

১১. Marcus Franda, Bangladesh : The First Decade News a Delhi, South Asian Publishers Pvt. Ltd. 1982. P: 225

১২. Kirseten Wewstergard, State and Rual Society in Bangladesh New Delhi, Selectd Book Services Ltd. 1986. P: 100.

১৩. Muhammad A Hakim, Bangladesh Politices: The Shahabuddin Interreges, Dhaka. UPL. 19893. P:11.

Dhaka University Institutional Repository

৩. গ. বিরোধী দলের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা ও কার্যক্রম :

এইচ এম এরশাদের শাসনামল (১৯৮২-৯০)

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার দৃশ্যত এরশাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান। লে. জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সলের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণপূর্বক দেশে সামরিক আইন জারি করেন। জাতীয় সংসদ বাতিল করেন এবং সংবিধান ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড স্থগিত ঘোষণা করেন।

লেখক মোহাম্মদ খোশবু তার বই বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল; এতে এরশাদ আগমনকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণে লেখক তার বইয়ের ২য় পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "১৪ এপ্রিল 'দৈনিক দেশ' বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ এখন নীরব" শীর্ষক একটি ছোট খবর পরিবেশন করে। এ সময়ে মূল রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হতো এবং বিএনপি দলীয় জিয়া ও সাত্তার সরকারের বিরুদ্ধে ১০ দলীয় জোটের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বায়তুল মোকাররম বেশ সরব হয়ে উঠেছিল। এরই মধ্যে ২৪ মার্চ এরশাদ কর্তৃক রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ফলে বায়তুল মোকাররম চত্বর নীরব নিভৃত অঙ্গনে পরিণত হয়।[১]

তথাপি এরশাদের সামরিক আইনজারির প্রতিবাদে ২৪ মার্চ রাতেই ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা পোস্টার তুলছিল তেমনি পাল্টা পোস্টার লাগাচ্ছিল ছাত্ররা।[২]

এরশাদ শাসনামলের প্রথম দিকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকার কারণে ছাত্রসমাজের মধ্যেই প্রারম্ভিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ছাত্র সমাজের এ আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রছন্ন সমর্থন ও আশীর্বাদ ছিল।

২৫ (১৯৮২) মার্চ বেশ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রীকে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ২৭ মার্চ (১৯৮২) তারিখে রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করা হয় প্রধান আইন প্রশাসকের আত্মীয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে। অতঃপর ৩রা এপ্রিল (১৯৮২) একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ও ৫টি সামরিক আদালত এবং ৪ এপ্রিল (১৯৮২) তারিখে ২০টি সংক্ষিপ্ত আদালত গঠন ২২ এপ্রিল (১৯৮২) তারিখে সামরিক সরকার দেশের প্রতিটি

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগে একটি হাইকোর্ট বেঞ্চ এবং থানা সদরে একটি আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অতঃপর ৮ জুন (১৯৮২) তারিখে দেশে হাইকোর্ট ডিভিশনের ৪টি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করা হয়।[৩]

মজিদ খানের শিক্ষানীতি

জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৬ মে তারিখে ড. আবদুল মজিদ খানকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তার মাধ্যমে শিক্ষানীতিকে পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা চালান। ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৮২) মজিদ খান তার শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। মজিদ খানের শিক্ষানীতি ঘোষণার পর পরই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্লোগান ওঠে মজিদ খানের শিক্ষানীতি 'মানি না মানব না'- শুধু ছাত্ররাই নয় এদেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পক্ষ থেকেও তুখোড় সমালোচনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মজিদ খানের শিক্ষানীতি গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।[৪]

১৪টি ছাত্র সংগঠন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। ১৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ২১ নভেম্বর ১৯৮২ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও সাংবাদিক সম্মেলন করেন।[৫]

১৯৮৩ সাল

১৯৮৩ সালের ৩১ জানুয়ারি ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানকে কটাক্ষ করে এরশাদের দেয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ১৫টি রাজনৈতিক দলের নেতারা এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। এরশাদ শাসনামলে এ প্রথম রাজনৈতিক দলগুলি অগ্রসর হয়। এই ১৫টি রাজনৈতিক দল নিয়েই পরবর্তীকালে ১৫ দলীয় জোট গঠিত হয়। এ দলগুলো ১৫ দলের জোটে শরিক হয় :

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (সভানেত্রী-শেখ হাসিনা)।

২. গণআজাদী লীগ (সভাপতি-মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ)।

৩. আওয়ামী লীগ (মিজান/সভাপতি-মিজানুর রহমান চৌধুরী)।

৪.আওয়ামী লীগ (ফরিদ গাজী/সভাপতি-দেওয়ান ফরিদগাজী)

৫. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সভাপতি- ময়মনসিংহ)।

৬. ন্যাপ (মোজাফ্ফর/সভাপতি- অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহম্মেদ)।

৭. ন্যাপ (হারুন/সভাপতি- চৌধুরী হারুন রশীদ)।

৮. জাতীয় একতা পার্টি (সভাপতি সৈয়দ আলতাফ হোসেন)।

Dhaka University Institutional Repository

৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) (সভাপতি মেজর অব. এমএ জলিল)।

১০. ওয়ার্কার্স পার্টি।

১১. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল।

১২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান ভূঁইয়া)

১৩. সাম্যাবাদী দল (তেয়াহা)

১৪. সাম্যবাদী দল (নগেন)

১৫. মজদুর পার্টি (আবুল বাশার)।

পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি (কাজী জাফর), বাংলাদেশ কনিউনিস্ট লীগ, আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ প্রমুখ দল নিয়ে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এরশাদ সরকারের বিতর্কিত শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। ওই দিন একটি ছাত্র মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল পেরিয়ে শিক্ষাভবনের নিকট পৌঁছলে সেখানে মোতায়েনকৃত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর লোকেরা ছাত্রছাত্রীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জসহ এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করে। এতে অনেক ছাত্রছাত্রীর হতাহতের খবর পাওয়া যায়। অতঃপর দুপুরে এক সরকারি ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।[৬] এরশাদের ক্ষমতা দখলের এক বছর পর ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক জোটের সৃষ্টি। একটি আওয়মী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট আর একটি বিএনপি নেতৃত্বে ৭ দলীয় ঐক্যজোট এ ২টি জোট ও অন্যান্য ছোট ছোট দলগুলো সামরিক শাসনের অবসান ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ৫ দফা দাবি পেশ করে।

৫ দফা দাবি নিম্নরূপ :

১. অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।

২. অবিলম্বে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর হতে সব বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. দেশে যেকোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে আগামী শীত মৌসুমের মধ্যেই সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সব বিষয় জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। সংবিধান সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে, অন্যকারও নয়।

৪. রাজনৈতিক কারণে আটক, বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সব রাজনৈতিক নেতা ও কর্মিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং সব রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৫. মধ্য ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার তদন্ত বিচার ও দোষীদের শাস্তি এবং নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। [৭]

এ ঘোষণার পর দেশে ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়।[৮]

১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষভাগে ১৫ ও ৭ দলের জোটসমূহে ৫ দফা আদায়ের আন্দোলনে ছাত্ররা মাঠে নামে। এদিকে জেনারেল এরশাদ ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের পর তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৫ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে গণবিক্ষোভ পালনকালে অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সেদিন রাতেই আওয়ামী লীগের হাসিনা, বেগম সাজেদা চৌধুরী, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ড. কামাল হোসেন, তোফায়েল আহমদ, মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, আব্দুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, মোহাম্মদ নাসিম ও ডা. এম এ মালেকসহ অনেক নেতাকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৮৩-এর ১ মার্চ তারিখে সামরিক সরকার দেশে রাজনৈতিক আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতাসহ অন্যান্য গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদান করে।

২৫ মার্চ ১৯৮৩ তারিখে মেজর জেনারেল এরশাদ কর্তৃক এক রেডিও টিভি ভাষণে ঘোষণা করা হলো ১ এপ্রিল ১৯৮৩ হতে দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করা হবে।

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার ছাত্রসহ আটক সবাইকে ২৬ মার্চ উপলক্ষে শুভেচ্ছা স্বরূপ মুক্তিদান করা হয়। মূলত সামরিক সরকার দেশে রাজনৈতিক আলোচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতাসহ অন্যান্য গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

১ এপ্রিল ১৯৮৩ থেকে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ঘরোয়া রাজনীতি অনুমোদিত হয় এবং জেনারেল এরশাদ কর্তৃক বিরোধী দলীয় নেতাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়ে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

২ এপ্রিল বিএনপির বহুল আলোচিত তলবি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সাত্তার ও বদরুদ্দোজা বিএনপি থেকে বহিষ্কার হন। তলবি সভায় সামশুদ্দিন হুদা চেয়ারম্যান ও ড. মতিন মহাসচিব নির্বাচিত হন।[৯]

৪ এপ্রিল মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীসের সভাপতিত্বে গণআজাদী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর আরোপিত সব বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারির হতাহতের তালিকা প্রকাশ, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান এবং বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়।

৬ এপ্রিল সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের (হাসিনা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৫ দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৯ এপ্রিল দাবিদিবস পালনের প্রস্তুতি হিসেবে।

২৮ এপ্রিলে এরশাদের সঙ্গে জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খানের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১০]

জুন মাসের শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডিস্থ বাড়িতে আওয়ামী লীগের ২ দিনব্যাপী বর্ধিত সভা শুরু হয়। জুন মাসেই আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় ঐক্যজোট ৯ দফা দাবিসম্বলিত কর্মসূচি ঘোষণা করে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন এবং অনতিবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

একই সঙ্গে বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত ৭ দলীয় জোট তাদের দাবি ঘোষণা করেন। তাদের দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের পদত্যাগ এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

১৯৮৩ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সেনাপ্রধান ও সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের এক ইফতার পার্টিতে দাওয়াত করেন। এ দাওয়াত ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের নেতারা প্রত্যাখ্যান করলেও বেশকিছু রাজনৈতিক নেতা যোগদান করেন।

১৯৮৩ সালের ৮ জুলাই সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জে. এরশাদ এক রেডিও ও টিভি ভাষণে নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়সূচি ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২ আগস্ট মহিউদ্দিন আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাকসহ ৬ জনকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তথাপি ১৯৮৩ সালের ৬ সেপ্টম্বর ২টি ভিন্ন মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয় ৫ দফার অভিন্ন কর্মসূচি। ১৫ ও ৭ দলের আয়োজিত সেই সভা থেকে শুরু হয় সরকার বিরোধী আন্দোলন। ২২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের রাজনীতি বাকশালকে পুনরুজ্জীবিত করেন মহিউদ্দিন আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাক।[১১]

১৯৮৩ সালের ১ নভেম্বরে ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহক্ষানে দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৪ নভেম্বর জেনারেল এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রকাশ্যে রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় এবং প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন।[১২]

কেউ কেউ এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন। অবশ্য বড় দলগুলো বলেছে, সামরিক শাসনের অধীনে কোনো নির্বাচন মেনে নেয়া হবে না।

১৬ নভেম্বর ১৫ দলের জনসভায় নেতারা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে সামরিক আইন প্রত্যাহার, সর্বাগ্রে সার্বভৌম পার্লামেন্ট নির্বাচনসহ ৫ দফা মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ব্যতিক্রম কোনো কিছু মেনে নেয়া হবে না।

২২ নভেম্বর ২৫ দলীয় নেতারা ঢাকার মিরপুর হতে নরসিংদী পর্যন্ত এক প্রতীকী পদযাত্রার আয়োজন করে।

২২ নভেম্বর ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের কয়েকজন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

২৮ নভেম্বর ১৯৮৩, ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের যৌথ আহ্বানে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। হাজার হাজার নেতাকর্মী এবং জনগণের সঙ্গে সচিবালয়ের দুপাশে অবস্থান নেন শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ব্যক্ত করে এবং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ওই অবস্থান ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সেদিন ঢাকায় সংঘটিত হয় ব্যাপক উত্তেজনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা। অতঃপর রাতে এক রেডিও টিভির ঘোষণায় সারা দেশে সব প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা পুনরায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সারা ঢাকায় পুনরায় সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়। ওই রাতেই বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে যথাক্রমে ক্যান্টেনমেন্টস্থ ও মহাখালীস্থ স্ব স্ব বাসস্থানে অন্তরীণ রাখা হয়। এছাড়া এ অবস্থান ধর্মঘটের সময় ও ওইদিন রাতে অনেক নেতাকর্মী ও সাধারণ লোককে গ্রেফতার করা হয়।[১৩] জেনারেল

Dhaka University Institutional Repository

এরশাদ স্বয়ং তার পূর্ববর্তী সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণে ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসের শেষেরদিকে 'জনদল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

১১ ডিসেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৪]

১৪ ডিসেম্বর (১৯৮৩) ২২ ও ২৮ নভেম্বরের ঘটনার অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাগুলো প্রত্যাহারসহ ওই দিবসদ্বয়ে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি প্রদান করা হয়। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ তারিখে বিরোধী দলগুলোর মতামতের তোয়াক্কা না করে দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু করেন এরশাদ। রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত আন্দোলনের মুখে ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে অবাধ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর থেকে সব প্রকার নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়া হয়। এ সময় থেকে রাজনৈতিক দলগুলো মূলত দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এ পর্যায়ে সরকারের ঠান্ডা ও গরম নীতির কারণে সব প্রধান রাজনৈতিক দলে বড় ধরনের ভাঙ্গন এবং ব্যাঙের ছাতার মতো নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থানের ঘটনা ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে বিরোধী দলগুলো সরকার বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে এ সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নেয়। ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট গড়ে। যা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ ২টি জোট সরকার বিরোধী অভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে। তারা এরশাদ কর্তৃক তার সরকারকে বৈধ করণের চেষ্টা ও তার গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় স্ব-উদ্ভাবিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে থাকে।

১৯৮৪ সাল

১৯৮৪ সালের ২ জানুয়ারি ছিল সারা দেশে পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের দিন। ৭ জানুয়ারি ১৯৮৪ সামরিক সরকার দেশে পুনরায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমোদন দেয়। ওইদিনই ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটের বাইরে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা এরশাদ কর্তৃক আহূত রাজনৈতিক সংলাপের অংশ হিসাবে বঙ্গভবনে তার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়। ১০ জানুয়ারি (১৯৮৪) দেশে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষকালব্যাপী নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ১২ জানুয়ারি ১৯৮৪ বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন মনোনীত

Dhaka University Institutional Repository

হন।[১৫] ২৭ জানুয়ারি ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয় উপজেলা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ছিল উপজেলা নির্বাচনের মনোনয়পত্র দাখিলের তারিখ। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ঢাকার নওয়াবপুর রোডে আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগের একটি মিছিলের ওপর পুলিশ গাড়ি চালিয়ে দিলে তার আঘাতে এবং চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে দুজন ছাত্র ঘটনাস্থলেই প্রাণহারায় এবং অনেক ছাত্র আহত হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারি সামরিক সরকার ঘোষণা করে, ২৬ মার্চ ১৯৮৪ থেকে অবাধ রাজনৈতির এবং ২৭ মে ১৯৮৪ তারিখে একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত। ১ মার্চ ১৯৮৪ ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের আহ্বানে সারা দেশব্যাপী পালিত হয় সর্বাত্মক হরতাল। এতে একজন নিহত হয়। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এদিনে পরবর্তী কর্মসূচির মধ্যে ২৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচনের দিন 'কালোদিবস' পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ১ মার্চের হরতালে বিভিন্ন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১ মার্চের পূর্বরাতে হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে অন্তরীণ করা হয় এবং ৫ই মার্চ তাদের মুক্ত করা হয়। ৩ মার্চ ১৯৮৪ তারিখে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোট সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানায় উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের। ৪ মার্চ উপজেলা নির্বাচনে ৭ শতাধিক প্রার্থী তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। ১৯৮৪-এর ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহে এরশাদ শাহীর বিরুদ্ধে আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। হরতাল, ধর্মঘট বিক্ষোভ সারা দেশে একাকার হয়ে পড়ে। ১৮ মার্চ ১৯৮৪ সামরিক সরকার উপজেলা নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের পূর্বপর্যন্ত। বিরোধী দলগুলো ২৪ মার্চের হরতাল স্থগিত করে ২১ তারিখের অন্যান্য কর্মসূচি বহাল রেখে। ২৪ মার্চ সামরিক সরকার দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সংঙ্গে পুনরায় সংলাপ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[১৬] মার্চে সরকার সমর্থক একটি ১৫ দলীয় জোট জন্মলাভ করে। নবগঠিত জোটের সদস্য দলগুলি হল মুসলিম লীগ (টি আলী), বিএনপি (দুদু-নীলু), বাংলাদেশ ইউনাইটেড ন্যাশনালিস্ট পার্টি, জনদল, ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ, নেজামে ইসলামী পর্টি...। মার্চের শেষেরদিকে সামরিক সরকার পুনরায় দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে অংশ নেয়ার আহ্বান জানায়। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ৫ দফার ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে সংলাপে যেতে রাজি হয়।

১ এপ্রিল ১৯৮৪ এক সমাবেশে খালেদা জিয়া বলেন, সংলাপ আপস নহে- সংগ্রামেরই অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

২ এপ্রিল বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গণে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় বক্তৃতাকালে জামায়েতে ইসলামীর অস্থায়ী আমীর মাওলানা আব্বাস আলী খাঁন ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানায়।[১৭] উল্লেখ্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে প্রস্তাব জামায়াত কর্তৃক উত্থাপিত হল তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বার্মায় ওই দেশের বিরোধী দল ১৯৫৮ সালে উত্থাপন করেছিলেন। অতঃপর সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ শুরু হয়।

৯ এপ্রিল ১৯৮৪ বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের ২০ সদস্য বঙ্গভবনে সংলাপের উদ্দেশ্যে যান। পরে তারা ৩৩ দফা দাবিনামা পেশ করেই বঙ্গভবন ত্যাগ করেন।

১০ এপ্রিল ১৯৮৪ জামায়াতের সঙ্গে সরকারের সংলাপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১১ এপ্রিল ১৯৮৪ শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় ৩৮ নেতা বঙ্গভবনে আলোচনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। এদিন ৩ ঘণ্টা আলোচনা হয়। একপর্যায়ে বাক বিতন্ডা শুরু হলে আলোচনা মূলতবি ঘোষণা করা হয়।

১২ এপ্রিল ১৯৮৪ বঙ্গভবনে এরশাদের সঙ্গে খালেদা জিয়ার একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ এপ্রিল ১৫ দলীয় জোটের সঙ্গে ২ দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২০ এপ্রিল ৭ দলীয় জোটের তৃতীয় দফা বৈঠক হয়।

২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ এরশাদ সরকারের সঙ্গে মোশতাকের নেতৃত্বাধীন কয়েকটি ডানপন্থী দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ দলের ৩০ এপ্রিলের ১৯৮৪ বৈঠকে সার্বভৌম সংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায় এবং আর আলোচনার অবকাশ সরকারে সঙ্গে নেই বলে নেতারা বলেন।

১ মে ১৯৮৪ মোশতাকের জনসভায় ৩ দফা বোমা হামলা হয় এবং একজন নিহত ও ২০জন আহত হয়।

এছাড়া ১ মে ১৯৮৪ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে পর পর ৪টি বোমা বিস্ফোরিত হয়।

এর প্রতিবাদে ৫ মে ১৯৮৪ দুপুর ১২টা পর্যন্ত হরতাল আহ্বান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপি ৫ দফার দাবিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানায়।

১৫ দল প্রেসিডেন্টের ভাষণের প্রতিবাদে ১৯ মে সমাবেশ ও বিক্ষোভের কর্মসূচি দেয়।

২০ মে ১৯৮৪ ১৫ ও ৭ দল এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ কর্মসূচি দেয়।[১৮]

শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের আহূত ২২ ও ২৩ মের ১৯৮৪ ধর্মঘটের প্রতি বিএনপি ৭ দলীয় জোট সমর্থন জানায়।

সরকার ও ঐক্যপরিষদের সঙ্গে ২১ মে ১৯৮৪ চুক্তিস্বাক্ষর হয় এবং ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

২৬ মে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ প্রতিবাদ দিবস পালন করেন এবং ৭ ও ১৫ দল রমজানপরবর্তী জোরালো আন্দোলনের ঘোষণা দেয়।[১৯]

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবি জানানো হয়।

৫ জুন ১৯৮৪ ১৫ দলের মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এবং ওই সমাবেশে এরশাদ বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

৯ জুলাই ১৯৮৪ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ও হাসিনার অন্যতম পরামর্শদাতা এম কোরবান আলী এরশাদের মন্ত্রিপরিষদে যোগদান করেন।

১২ জুলাই ১৯৮৪ সামরিক সরকার ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখে কেবলমাত্র জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৩০ জুলাই ১৯৮৪ বিএনপির অন্যতম প্রবীণ ও বিপ্লবী নেতা ক্যাপ্টেন (অব.) আবদুল হালিম চৌধুরী এরশাদের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ২ নেতা সামরিক জান্তার মন্ত্রিপরিষদে যোগদানে জনগণ শুধু বিস্মিতই হয়নি। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধও হয়।

১৫ আগস্ট ১৯৮৪ তারিখে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমাবাজি সংঘটিত হয়।

১৮ আগস্ট ১৯৮৪ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ রেডিও ও টিভি ভবনদ্বয়ের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শিত হয়।

২৭ আগস্ট ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোটের আহ্বানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

বিরোধী দলগুলো সামরিক শাসনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিয়ত সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে বিভিন্ন বিক্ষোভ দিবস ও বিক্ষোভ সমাবেশ চলতে থাকে।

৩০ আগস্ট ১৯৮৪ দেশের ডাক্তাররা পালন করেন ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট।[২০]

উল্লেখ্য, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবীদের সমাবেশে শেখ হাসিনা তার ভাষণে ১৯৭৫ সালের পরে সব সরকারকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করে। এর ফলে বিএনপির নেতা ও কর্মিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ তারিখে দৈনিক দেশ প্রত্রিকা প্রকাশের দাবিতে সারা দেশে সংবাদপত্রগুলো এক দিনের জন্য বন্ধ থাকে।

১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ সারা দেশে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। ওইদিন ব্যাপক ভাঙচুর, মিছিলে গুলিবর্ষণ, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর হয়। বিভিন্ন স্থানে ৭ ও ১৫ দলের সমাবেশে বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয়।

বিভিন্ন সমাবেশ সভা দলীয় কার্যালয়ের বৈঠকে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া।

২৭ সেপ্টেম্বর কালিগঞ্জে প্রদর্শিত বিক্ষোভ মিছিলে সামরিক সরকার সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। ওইদিনই কালীগঞ্জের জাতীয় পার্টির কুখ্যাত নেতা আজম খান প্রকাশ্য দিবালোকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা ও বাংলাদেশ রেডক্রসের ভাইস চেয়ারম্যান ময়েজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রকাশ্য দিবালোকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করে।

৩ অক্টোবর ১৯৮৪ এরশাদের সামরিক সরকার সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ ও খবর পত্রিকা ২টির প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৩ অক্টোবর ১৯৮৪ ১৫ দল, ৭ দল, জামায়াত প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল করে হরতালে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবি করে নেতারা।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয় সরকারের তরফ থেকে বিরোধী দলগুলোর ৫ দফা উপেক্ষা করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণাকে ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। পুনরায় বিরোধী দলগুলো সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

১৪ অক্টোবর ১৯৮৪ ১৫ ও ৭ দলীয় জোট বিশাল সমাবেশ করে নয়া আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানায়।

১৫ দল আর কোনো সংলাপ বা গোলটেবিল বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

উভয় জোটই ১৪ অক্টোবরের সমাবেশ থেকে ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ ২৪ ঘণ্টার হরতালসহ ২৭ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৪ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়।

দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার কারণে ২৭ অক্টোবর ১৯৮৪ তারিখে সরকার, ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। ২৫ নভেম্বর ১৯৮৪ তারিখে এরশাদ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তার চাকরির মেয়াদ আরো এক বছরের জন্য বৃদ্ধি করেন।

১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহ্বানে ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সারা দেশে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ১৫ ডিসেম্বর এরশাদ এক বেতার ও টিভি ভাষণে ৮ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচন বাতিলের কারণ ব্যাখ্যা করে শিগগিরই নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪ তারিখে বিরতিহীন ২৪ ঘণ্টার সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করে এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০ ডিসেম্বর সামরিক সরকার ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪ ২ দিনের জন্য হরতালসহ সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তথাপি সামরিক সরকারের ওই ঘোষণা সত্ত্বেও সারা দেশে ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৪ বিরতিহীনভাবে পালিত হয় ৪৮ ঘণ্টার সর্বাত্মক হরতাল।[২১]

১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৪ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বেতার ও টেলিভিশনে একতরফা ও বিশেষ দলীয় প্রচার এবং মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় চেতনা বিরোধী অপসংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি প্রচার বন্ধের দাবিতে জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করে।

১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রতিরোধ দিবস পালন করে।[২২]

১৯৮৫ সাল

১৫ জানুয়ারি ১৯৮৫ এক সরকারি ঘোষণায় ৬ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখ সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারণপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠানের নতুন তফসিল ঘোষণা করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে গুলিতে নিহত হন ছাত্রলীগ নেতা রাউফুন বসুনিয়া। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের বিক্ষোভে সরগরম হয়ে ওঠে। যদিও অনেকেই মনে করেন ওই হত্যাকান্ডে সামরিক সরকারের বিশেষ বিভাগের কতিপয় লোকের হাত ছিল তথাপি ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন ছাত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। একই তারিখে ১৫ ও

Dhaka University Institutional Repository

১৭ দলীয় ঐক্যজোট সরকার ঘোষিত ৬ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[২৩]

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ঢাকায় আংশিক হরতাল পালিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে মনোয়নপত্র দাখিল স্থগিত ঘোষণা করা হয় বিরোধী দলগুলোর চাপের মুখে।

১ মার্চ ১৯৮৫ তারিখ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সঘোষিত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রেডিও-টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেন, দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ও অসহযোগিতার কারণে প্রস্তাবিত ৬ এপ্রিল ১৯৮৫ তারিখের সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর তার প্রতি জনগণের আস্থা আছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য তিনি ২১ মার্চ ১৯৮৫ তারিখে 'গণভোট' অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে এরশাদ দেশে পুনরায় আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর এবং বিশেষ সামরিক আইন আদালত পুনর্বহালের কথা ঘোষণা করেন। এছাড়াও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়।[২৪] অতঃপর ২ মার্চ ১৯৮৫ নির্বাচন কমিশন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মসূচি বাতিল ঘোষণা করে।

২১ মার্চ ১৯৮৫ দেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এরশাদ হ্যাঁ 'না' ভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই করলেন। কিন্তু ভোট কেন্দ্রগুলোতে গণভোটের দিন দেখা গেল ভোটার নেই। এরশাদের অর্থে পালিত কিছু কর্মী বাহিনী সিল মেরে ভোটের বাক্স ভরে দিয়েছে এবং এরশাদ তার নিজের পক্ষে রায় হয়েছে বলে ঘোষণা দেন।[২৫]

৯ এপ্রিল ১৯৮৫ নির্বাচন কমিশন ১৬ ও ২০ ১৯৮৫ উপজেলা নির্বাচনের ঘোষণা দেয় এবং যথারীতি বিরোধী দলের সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়াই নির্বাচন যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।[২৬] দীর্ঘ ৫ মাস বন্ধ থাকার পর ২৩ জুলাই ১৯৮৫ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়া হয়।[২৭]

এরশাদ সরকার এ বছর তার মন্ত্রিপরিষদ পুনর্গঠনের কাজ করেন। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, তার স্বার্থরক্ষাকারী ব্যক্তি এবং বড় রাজনৈতিক দলের দলছুট নেতাদের সমন্বয়ে তার মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হয়।

১৬ আগস্ট ১৯৮৫ এরশাদ জনদল ভেঙ্গে গঠন করেন ৫টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি জাতীয় ফ্রন্ট।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

ঘরোয়া রাজনীতি বন্ধ থাকায় দেশের বিরোধী দলগুলোর কার্যক্রম স্তিমিত ছিল।

১ অক্টোবর ১৯৮৫ থেকে পুনরায় ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ১১ নভেম্বর ১৯৮৫ তারিখে ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে সারা দেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ তারিখ এক রেডিও-টিভির ভাষণে এরশাদ দেশে ১ জানুয়ারি ১৯৮৬ তারিখ থেকে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[২৯]

১৯৮৫ সাল এ সময়টা জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নিজের ক্ষমতাকে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য গণভোট, উপজেলা নির্বাচন, সর্বোপরি এরশাদ তার পূর্বসূরি জেনারেলদের মতো ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিভিন্ন দল ভেঙে তার নিজস্ব দল গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেন।

১৯৮৬ সাল

১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জেনারেল এরশাদ জাতীয় ফ্রন্টকে জাতীয় পার্টিতে পরিণত করেন। ইতিমধ্যে তার দলে বিরোধী প্রধান দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ নেতার আবির্ভাব ঘটে। ১২ জানুয়ারি ১৯৮৬ নবগঠিত জাতীয় পার্টি বায়তুল মোকাররমের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে। এ সমাবেশে এরশাদ ঘোষণা করেন 'জাতীয় পার্টি' 'আমার দল'।

সরকারের এসব কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকার বিরোধী আন্দোলনও দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি ঘোষণার পর থেকে পুনরায় এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এরশাদের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট রাজপথ দখল করে।

১৯৮৬ সালের ২ মার্চ এক রেডিও-টিভির ভাষণে জেনারেল এরশাদ ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ তারিখে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করে। ১৯৮৬ সালের ২০ ও ২১ মার্চ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে, সামরিক শাসন অবসান সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ২১ মার্চ ১৯৮৬ পর্যন্ত প্রধান রাজনৈতিক জোটসমূহের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২১ (১৯৮৬) মার্চ এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বিরোধী জোটগুলোকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে এবং প্রশাসন নির্বাচনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিরোধী দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে সব ধরনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হবে। নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোনো প্রচার করা হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ আদেশ আগামীকাল থেকে কার্যকর হবে।[৩০]

এদিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ২১ মার্চ ১৯৮৬ সন্ধ্যায় ১৫ ও ৭ দলীয় ঐক্যজোটদ্বয়ের নেতারা পৃথক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। গভীর রাত পর্যন্ত তাদের বৈঠক চলে তথাপি চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২২ মার্চ সমাবেশে ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের আহ্বানে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।

২২ মার্চ ১৯৮৬ সন্ধ্যায় রেডিওর এক ঘোষণায় বলা হয়, ১৫ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২২ মার্চ ১৯৮৬ সন্ধ্যায় ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে ১৫ দলীয় জোট নেতাদের বৈঠক হয়। এ বৈঠকেও আসন বণ্টন নিয়ে সৃষ্ট মতবিরোধের কারণে বামপন্থী কয়েকটি দল ১৫ দল থেকে বেরিয়ে যায় এবং তারা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত জানায়।

৭ দলীয় জোটও পরিশেষে নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত জানায়। ১৫ দল থেকে বের হয়ে আশা দলগুলো ৫ দলের জন্ম দেয়। ২৪ মার্চ ১৯৮৬ ছিল এরশাদের কার্যকরী ক্ষমতা দখলের দিন। অর্থাৎ এ দিনটিকে বিভিন্ন সংগঠন দল ও জোট 'কালো দিবস' হিসেব আখ্যায়িত করে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ দিবস উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে এক বিশাল জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া বলেন, আমরা নির্বাচন চাই, নির্বাচন করব এবং নির্বাচনের মাধ্যমেই আমরা ক্ষমতায় যেতে বিশ্বাসী। কিন্তু জনগণের কাছে যে ওয়াদা দিয়েছি ৫ দফার তা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে যেতে পারি না এবং ৫ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

১৫ দলীয় জোটও ২৪ মার্চকে 'কালো দিবস' হিসেবে পালন করে। নির্বাচনী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে ব্যালটের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকারের অধীনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ৮ দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ করায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজের বড় ধরনের ক্ষতিসাধিত হয়। ১৫ দলের মতো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও নির্বাচনপন্থী ও নির্বাচন বিরোধী ২ শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্বাচন বিরোধী নেতারা আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে তাকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে অনুরোধ করে। কিন্তু শেখ হাসিনা তার সিদ্ধান্তে অটল ও অনড় থাকেন। সাপ্তাহিক বিচিত্রা তাদের 'বাংলাদেশ বর্ষপত্র ১৯৯১' সংখ্যায় শেখ হাসিনা সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'জনগণ শেখ হাসিনাকে মনে করে বিচক্ষণ রাজনীতিক ও কৌশলী নেত্রী হিসেবে। বাস্তবিকপক্ষে তা হলেও তিনি ১৯৮৬ সালে সফল হন না। এরশাদের নির্লজ্জ, বেহায়াপনা, মিথ্যাচার ও মিডিয়া ক্যু-এর কাছে তিনি মার খেয়ে যান।'

শেখ হাসিনার নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আন্দোলনকামী দল, জোট ও ছাত্র সমাজ ক্ষুব্ধ হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ শ্রমিক-কর্মচারী, আইনজীবী, শিক্ষক ও সাংবাদিকসহ সংগ্রামরত সব সংগঠনের সঙ্গে যৌথ বৈঠকে ১৫ ও ৭ দলকে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে ছাত্ররা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বতন্ত্র ধারার রাজনীতি শুরু করবে। ২৪ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও দেশব্যাপী 'কালো দিবস' পালন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা আখতারুজ্জামান। তিনি বলেন, জাতীয় দাবি ৫ দফার লক্ষ্য হলো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া চিরতরে বন্ধ করা।[৩১]

ইতিমধ্যে নির্বাচনের তারিখ পুনর্নির্ধারণ করে ৭ মে ১৯৮৬ করা হয়। ৪ মে ১৯৮৬ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ঘটলে ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।[৩২]

উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা মার্চের ২০ তারিখ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন, ২২ মার্চ তারিখ মনোয়নপত্র দাখিল প্রতিরোধ করতে হবে, যারা এ নির্বাচনে অংশ নেবে তারা জাতীয় বেইমান হিসেবে চিহ্নিত হবে। অথচ এরশাদের কূটকৌশলের জালে জড়িয়ে গিয়ে তিনি এ প্রহসনমূলক নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিরোধী দলীয় আন্দোলনের ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের জন্ম দিলেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও ওই নির্বাচনে অংশ নেয়। ৭ মে ১৯৮৬ তারিখ হিংসাত্মক প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮৪ কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। ফলাফল ঘোষণার এক পর্যায়ে এরশাদ সরকার কারচুপির লক্ষ্যে রেডিও ও টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা বন্ধ করে দেয় এবং পরবর্তীতে বহুলভাবে প্রচলিত 'মিডিয়া ক্যু'র

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল ছিনিয়ে নিয়ে এরশাদ সমর্থনপুষ্ট জাতীয় পার্টিকে ১৮৩টি আসনে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এবং আওয়মী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীকে যথাক্রমে ৭৬ এবং ১০টি আসন দেয়া হয়।

৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এরশাদের নেতৃত্বাধীন সামরিক সরকার নির্বাচনে ভয়ভীতি প্রদর্শন, বল প্রয়োগ, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, জালভোট প্রদান এবং সর্বোপরি সরকারি প্রশাসনিক যন্ত্রসহ নির্বাচন কমিশনকে ভীতি প্রদর্শনে সরকারের পক্ষে 'মিডিয়া ক্যুর' মাধ্যমে ৮ দলীয় ঐক্যজোটের প্রকৃত বিজয়কে নস্যাৎ করা হয়েছে। তারা ভোট পুনর্গণনা এবং যেসব আসনে শাসক দল কর্তৃক অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে যেসব আসনে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায়। (সূত্র : সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ মে, ১৯৮৬)। নির্বাচনের প্রায় ২ মাস পর তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে বসে ১৯৮৬ সালের ১০ জানুয়ারি। ওই সংসদের শামসুল হুদা স্পিকার এম কোরবানী আলী ডেপুটি স্পিকার, মিজানুর রহমান চৌধুরী সংসদ নেতা এবং শেখ হাসিনাকে বিরোধী দলের নেত্রী নির্বাচিত করা হয়। আওয়ামী লীগ এ অধিবেশন বর্জন করে।[৩৩]

এ সংসদের উল্লেখযোগ্য কাজ হলো অধিবেশনে সপ্তম সংশোধনী বিল পাস। এ বিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদের সামরিক আইন জারি এবং তারপর থেকে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত গৃহীত সব আইন নির্দেশ ও অধ্যাদেশ এবং তার বলে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোর অনুমোদন বা বৈধকরণ করে নেয়া। এ অর্থ বিলের তীব্র বিরোধিতা করে বিলের প্রতিবাদে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে বিরোধী দল। অন্যন্যা দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থনে জাতীয় পার্টি বিলটি পাস করার মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেয়।

তৃতীয় জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ৭ ও ৫ দলীয় জোট সংসদ বাতিলের দাবি জানাতে থাকে।[৩৪] এরশাদের সপ্তম সংশোধনীর বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো রাজপথে ব্যাপক গণআন্দোলনের ডাক দেয়।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করে নিজেকে তার চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ এরশাদ নিজেকে জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইত্যবৎসরে, এক সরকারি ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত করা হয় ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬ তারিখ। ওই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারণ করা হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখ এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মনোনয়পত্র দাখিল করেন। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় ঐক্যজোট, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় ঐক্যজাট, মাওবাদী বামপন্থী ৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং জামায়াতে ইসলামী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার বিভিন্ন জেলার জনসভায় পুলিশ বাধা প্রদান করে এবং জনসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অবশেষে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গৃহবন্দি করা হয়। ওই দিন বিরোধী দলগুলোর ডাকা সকাল-সন্ধা হরতাল থাকা সত্ত্বে এবং বিরোধী দলগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নির্বাচনী নাটকীয়তা শেষে বিজয়ী হয়ে ২৩ অক্টোবর ১৯৮৬ জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।[৩৬]

বিরোধী জোটগুলোর ডাকা ২৩ অক্টেবর 'কালো দিবস' উপলক্ষে ৮ দল সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জেনারেল এরশাদের সাড়ে ৪ বছরের কার্যক্রম বৈধ করার জন্য সংসদে যারা ভোট দেবেন, জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না' অন্যদিকে বেগম জিয়াও দেশব্যাপী আহূত ওই 'কালো দিবস' উপলক্ষে বলেন, আসুন আমরা সামরিক শাসনজারির পর যেভাবে আন্দোলন শুরু করেছি সেভাবে আবার আন্দোলন শুরু করি এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন জানাই। জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁকে অপসারণের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।[৩৭]

১৯৮৭ সাল

১৯৮৭ সাল শুরু হয় যথারীতি বিরোধী দলগুলোর নিয়মিত রাজনৈতিক কর্মকান্ড দিয়ে। ক্রমশ: স্বৈরাচার জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেন। ১৯৮৬ সালের সূচিত সামরিক শাসন বিরোধী পাঁচদফার আন্দোলন এ বছর পুরোদমে চলতে থাকে। এ সময় জাতীয় সংসদ বাজেট, বিরাষ্ট্রীকরণ ও জেলা পরিষদ বিল উত্থাপনের ফলে সরকার বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এসব বিল বাতিল এবং স্বৈরশাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধী দলগুলো যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১ জানুয়ারি ১৯৮৭ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র এবং পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ৮, ৭, ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

২১ এপ্রিল ঢাকায় একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়।

২১ জুন ৩ জোটের আহ্বানে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।

১২ জুলাই সরকার জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ সংশোধনী বিল পাস করে নেয়। ওই বিলে সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনে জড়িত করার ব্যবস্থা করা হয়। ওই বিলের বিরুদ্ধে ৮ দলীয় জোট সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে এবং ১৩ জুলাই সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালন করে। ১৪ জুলাই ১৯৮৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে ২ জন নিহত ও অসংখ্য ছাত্র আহত হয়। এ ঘটনায় সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।[৩৮]

৩ জোট (৮, ৭, ও ৫) জেলা পরিষদ বিল বাতিল এবং এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে ২২ জুলাই ১৯৮৭ থেকে দেশব্যাপী বিরতিহীন ৫৪ ঘণ্টার সর্বাত্মক হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে। অবিরাম হরতাল পালন শেষে ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত ৮ দলীয় জোটের জনসভা থেকে ৩০ জুলাই ১৯৮৭ সারা ঢাকায় বিক্ষোভ ও রাষ্ট্রপতির সচিবলায় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ৩০ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে সব বিরোধী দল যোগদান করে। ফলে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরশাদ বাধ্য হয়ে জেলা পরিষদ বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য ১ আগস্ট সংসদে ফেরত পাঠান।

১২ আগস্ট ১৯৮৭ তারিখে সারা দেশে পালিত হয় শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) আহূত ২৪ ঘণ্টা হরতাল।

১৩ আগস্ট ১৯৮৭ সরকার দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার প্রকাশনা অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৬ আগস্ট (১৯৮৭) ৮,৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট ৭ অক্টেবর ১৯৮৭ তারিখে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২৮ আগস্ট ১৯৮৭ তারিখ এরশাদ এক ঘোষণায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ তারিখে বঙ্গভবনে আলোচনা বৈঠকের আহ্বান জানান। ২৯ আগস্ট ১৯৮৭ তারিখে ৮ দলীয় ঐক্যজোটসহ বিরোধী দলগুলো ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৪ অক্টোবর তারিখে বিরোধী দলগুলো দেশে ভয়াবহ বন্যায় উদ্ভূত

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতির কারণে 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচির তারিখ পরিবর্তন করে ১০ নভেম্বর তারিখ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯ ও ২০ অক্টোবর শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদ এর (স্কপ) আহ্বানে ৪৮ ঘণ্টার বিরতিহীন হরতাল পালিত হয়। ১৪ অক্টোবর ১৯৮৭ তারিখে সরকার বিরোধী ঐক্যজোট ত্রয়ের ডাকা ১০ নভেম্বরের 'ঢাকা অবরোধ' কর্মসূচিকে বেআইনী ঘোষণা করে। জোট এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ২৬ অক্টোবর ১৯৮৭ উপজেলা সদরসমূহে ঘেরাও কর্মসূচি যথাযথভাবে পালিত হয়।

২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার মধ্যে তাদের দলীয় শীর্ষ নেতাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠক শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, 'স্বৈরাচারী এরশাদ' সরকারের পতন ঘটানোর জন্য আমরা ১ ও ১০ নভেম্বরসহ আন্দোলনের সব কর্মসূচির সাফল্যের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাব।

১ নভেম্বর (১৯৮৭) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটসমূহের জেলা পরিষদগুলো ঘেরাও কর্মসূচি যথাযথভাবে পালিত হয়। এ সময় বহু স্থানীয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী দিনও শত শত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ৮ নভেম্বর এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকা শহরে ৫ বা ততধিক লোকের মিছিল ও সমাবেশ, ১৫ নভেম্বর ১৯৮৭ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ দিনই সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে। ৯ নভেম্বর ১৯৮৭ তারিখে সরকার দেশের কয়েকটি ফেরিঘাট ও ঢাকামুখী যাত্রীবাহী ট্রেন বন্ধ করে দেয় এবং ১৪৪ ধারা জারি করে।

সরকার ঘোষিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে হাজার হাজার লোক রাস্তায় মিছিল বের করে। বিভন্ন স্থানে ছাত্র-জনতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা মিছিলকারীদের ওপর লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপসহ গুলিবর্ষণ করে। এতে চারজন নিহত এবং অনেক লোক আহত হয়। নিহতদের অন্যতম ছিল নূর হোসেন নামে এক বলিষ্ঠ সুঠামদেহী যুবক। নূর হোসেন তার জামাবিহীন শরীরের বুকে 'স্বৈরাচার নিপাত যাক এবং পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তিপাক' লিখে নিয়ে একটি ছাত্র-জনতার মিছিলের অগ্রভাগে ছিল। ঘাতকের বুলেট নূর হোসেনের বুক ভেদ করে বের হয়ে যায়। অকুস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ১১ নভেম্বর সরকার ৮ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২ নভেম্বর ৩ জোটের আহ্বানে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ওই দিনই সরকার এক ঘোষণায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় দেখামাত্র গুলি করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়। ১৪ থেকে ১৭ নভেম্বর প্রতিদিন সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। এ সময় ব্যাপক সংঘর্ষ ও শত শত নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়। ১১ ও ১২ নভেম্বর ৩ জোটের আহ্বানে সারা দেশে পালিত হয় বিরতিহীন ৪৮ ঘণ্টার সর্বাত্মক হরতাল। অতঃপর ২৩ ও ২৪ নভেম্বর সারা দেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ২৫ নভেম্বর ঢাকায় কয়েকটি স্থানে সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৭ নভেম্বর ঢাকাসহ সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণাসহ, ঢাকা চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও নারাণয়গঞ্জে 'সান্ধ্যা আইন' জারি করে। ২৮ নভেম্বর ১৯৮৭ তারিখে এরশাদ এক বেতার ও টিভি ভাষণে রাজনৈতিক সমস্যা নিরাময়ে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব দেয়। ২৯ ও ৩০ নভেম্বর তথা ১ ডিসেম্বর ১৯৮৭ বিরোধী দলগুলোর আহ্বানে সারা দেশে বিরতিহীন ৭২ ঘণ্টার সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ৩ ডিসেম্বর সরকার সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার প্রকাশনা অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ৫ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের একসভায় জাতীয় সংসদ থেকে আওয়ামী লীগ সদস্যদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ তারিখে এরশাদ তৃতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১০ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে অন্তরীণ থেকে মুক্তি দেয়া হয়। ১১ ডিসেম্বর সরকার পুনরায় দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি প্রদান করে। ১২ ডিসেম্বর (১৯৮৭) ৭, ৮ ও ৫ দলের আহ্বানে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ৩ জোটের আহ্বানে সারা দেশে বিরতিহীন ৪৮ ঘণ্টা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং ২৯ তারিখ শুধু ঢাকা শহরে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে গতিশীল রাখার প্রয়াশে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, জনগণের একদফা আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে পদত্যাগ করতেই হবে। এর পাশাপাশি তারা নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের দাবিতে অটল থাকে। তৃতীয় সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার পর পরই জেনারেল এরশাদ ৯০ দিনের মধ্যে ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। তদঅনুযায়ী ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন। আন্দোলনরত সব জোট ও দলগুলো জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অধীনে আর কোনো

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা দেন সব বিরোধী জোট ও দল নির্বাচনের ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচন প্রতিরোধ করার ডাক দেয়।[৩৯]

১৯৮৮ সাল

১৯৮৮ সালের ৮ জানুয়ারি ৩ জোটের (৮, ৭ ও ৫) এক যৌথ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, এরশাদের অধীনে আর কোনো নির্বাচনে তারা অংশ নেবে না।[৪০] ২০ জানুয়ারি ১৯৮৮ ৩ জোটের আহ্বানে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ওই হরতালের দিন ঢাকা শহরের কয়েকটি স্থানে জাতীয় পার্টির মাস্তানরা জোটের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায় এবং সংঘর্ষ বাঁধে।

২৪ জানুযারি ১৯৮৮ শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ৮ দলীয় জোটের পূর্ব নির্ধারিত জনসভায় যোগদান করেন। শেখ হাসিনা বিভিন্ন স্থানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। অবশেষে মূল জনসভা মঞ্চে উঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই কে বা কারা শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। শেখ হাসিনাকে বাঁচাতে গিয়ে গুলিতে নিহত হন আবুল কাশেম। এরপর শুরু হয় নিরীহ জনতার ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলিবর্ষণ। পুলিশ কমিশনার রকিবুল হুদার নেতৃত্বে স্বৈরাচারী সরকারের আইন রক্ষাকারী বাহিনী এবং সরকারের ভাড়া করা সশস্ত্র মাস্তান গুন্ডাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়।[৪১]

ওই ঘটনায় ২৫-৩০ জন নিহত হয় এবং আহত হয় বিপুল সংখ্যক ছাত্র-জনতা। নিহত ২৪ জনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২৫ জানুযারি ১৯৮৮ চট্টগ্রামে অর্ধদিবস হরতাল ও ২৬ জানুয়ারি ১৯৮৮ সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়।[৪২]

উল্লেখ্য, ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ তারিখে সরকার এক নতুন আদেশ জারির মাধ্যমে সব ধরনের নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করে।[৪৩] এ আদেশে বলা হয় :

ক. জাতীয় সংসদ ও পৌরকরপোরেশন নির্বাচন প্রতিরোধ কিংবা নির্বাচনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কিংবা প্রকাশ্য স্থানে কোনো সভা ও সমাবেশ করা যাবে না।

খ. নির্বাচন বিরোধী সভা ও সমাবেশে কেউ ভাষণ দিতে পারবে না বা এ ব্যাপারে কোনো স্লে-াগান তোলা বা মিছিল করা যাবে না।

গ. নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে এমন তৎপরতায় কাউকে লিপ্ত হতে দেখা যাবে না।

এভাবে অবশেষে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ একটি উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পুনরায় আরেকটি ভোটার এবং প্রতিযোগিতাবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

সম্পন্ন করা হয়। নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ করেনি। এ নির্বাচন রাষ্ট্রপতি জেনারেল হোসাইন মুহাম্মাদ এরশাদের জাতীয় পার্টি ও জেনারেল এরশাদ সমর্থক কমবাইন্ড অপজিশন পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সিরাজী এবং ফ্রিডমপার্টিসহ মোট ৮টি পার্টি অংশগ্রহণ করে। মূলত : এসব দলকে নানা ধরনের সুবিধা দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো হয়। জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের জন্য ৯৭৭ জন প্রার্থী ছিল। পূর্বনির্ধারিত ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। এতে যথারীতি জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয়লাভ করে বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়।[৪৪] বিরোধী দলগুলো এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে এবং এ সংসদকে ভোটারবিহীন নির্বাচিত সংসদ হিসেবে চিহ্নিত করে। জেনারেল এরশাদ সরকার নির্বাচনে মিডিয়া ক্যু ও ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। দেশ বিদেশের সব রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতায় রেখে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয়।

৭ জুন ১৯৮৮ তারিখ জাতীয় সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী ১৯৮৮ অনুমোদিত হয়। এ দেশের বিভিন্ন মহলের বিরোধিতা সত্ত্বেও এরশাদ সরকার রাষ্ট্রীয় ধর্ম বিল পাস করে করে নেয়। এর প্রতিবাদে ১৩ জুন (১৯৮৮) ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে সারা দেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল।[৪৫] এর বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এছাড়া ওই অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট ভেঙ্গে ঢাকার বাইরে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটসহ ৬টি জেলা সদরে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি করে বেঞ্চ রাখার বিধান রাখা হয়। বিরোধী দলগুলো এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর দেশের আইনজীবীদের দাখিলকৃত এক রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক অষ্টম সংশোধনীর হাইকোর্ট বিকেন্দ্রীকরণ এ অংশটি, সংবিধানপরিপন্থী ঘোষণা করা হয়। ফলে জেলা সদরে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন বিল বাতিল করা হয়। এ ঐতিহাসিক রায় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[৪৬] ৮ জুন ১৯৮৮ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী সমিতি আদালত বর্জন, সভা ও শোভাযাত্রা করে সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের আহ্বানে ১৪ জুলাই সারা দেশে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। এমনকি সরকার অনুগত বিরোধী দলও অষ্টম সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ওয়াকআউট করে। ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলো এরশাদ বিরোধী কোনো আন্দোলন সংগঠিত করতে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যর্থতার অন্যতম কারণ দেশের ২টি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে আদর্শগত, রাষ্ট্রীয়, সরকার ও শাসন পদ্ধতিগত ব্যাপারে মতভেদ। এছাড়াও এ দল ২টির নেতৃত্বের মধ্যে পাস্পরিক অবিশ্বাস এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম, কৌশল, পথ ও পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে পার্থক্যও অনেকাংশে দায়ী। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিককাল থাকার লক্ষ্যে এরশাদ এ বিষয়গুলোর শুধু ব্যবহারই করেননি। তিনি এ ২টি দলের নেতৃত্বের বিরোধকে আরো প্রকট করে তুলতে সক্ষম হন সুচতুর কূটকৌশলে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সালের জুন মাসের পর হতে এ ২টি দলের নেত্রী যতটা সময় ব্যয় করেন এরশাদ ও তার সরকারের কার্যকলাপের বিরোধিতায় তারচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেন ও ব্যস্ত থাকেন পারস্পরিক সমালোচনায়। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন শিবিরের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও জাতীয়তাবাদী দল সমর্থিত ছাত্রদল, এদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে সংঘর্ষ, হামলা, পাল্টা হামলা, খুনাখুনি চলতে থাকে। দেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ এ দ্বন্দ্বের ফলে জনগণ শুধু আঘাতপ্রাপ্তই হয়নি, বিভ্রান্তও হয়েছে দারুণভাবে। এসব কিছুর ফলশ্রুতিতে এরশাদ ও তার সরকার শুধু লাভবানই হননি, নির্বিঘ্নে ও নির্ঝঞ্ঝাটে অতিবাহিত করেন ১৯৮৮ সাল।

সর্বোপরি বিরোধী দলগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এসব ছাত্র সংঘর্ষের ফলে প্রায়শই দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ঘোষিত হয় এবং অনেক তরুণ ছাত্র ও যুবক হতাহত হয়।

১৯৮৯ সাল

১৯৮৯ সালের ১১ জানুয়ারি ঢাকায় আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য কংগ্রেসম্যান স্টিফেন সোলস। তিনি ঢাকায় এসে প্রেসিডেন্ট এরশাদ, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দেখতে আগ্রহী।[৪৭]

২৪ জানুয়ারি ১৯৮৯ ৭ দলীয় জোট ও জামায়েতে ইসলামীর আহ্বানে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ তারিখে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। ২১ মার্চ আওয়ামী লীগ জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানায়। ২৮ জুন ১৯৮৯ আওয়ামী লীগের আহ্বানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বাজেটে কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।[৪৮]

Dhaka University Institutional Repository

৬ জুলাই এরশাদ জাতীয় সংসদে নবম সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন এবং বিরোধী দলের চরম বিরোধিতার মুখে ১০ জুলাই সংসদে নবম সংশোধনী বিলটি পাস করে। ১০ আগস্ট গভীর রাতে শেখ হাসিনার বাসভবনে (বঙ্গবন্ধু ভবন) সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। শেখ হাসিনা এ ঘটনাকে তার প্রাণনাশের চেষ্টা বলে অভিযোগ করেন।[৪৯]

৩ সেপ্টেম্বর (১৯৮৯) ৮ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে ঢাকায় পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ১৭ ও ১৮ অক্টোবর শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বানে সারা দেশে বিরতিহীন ৪৮ ঘণ্টার হরতাল পালিত হয়।

১ নভেম্বর ১৯৮৯ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের ১২৭ নেতাকর্মী গুলিস্তান চত্বরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে ১০ ঘণ্টার এক প্রতীকী অনশন পালন করেন। এ সময়ে মঞ্চে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ সংগঠিত হয়। ডানপন্থী, বামপন্থী, রাজাকার, মুক্তিযাদ্ধা, এরশাদ বিরোধী, বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা খালেদা জিয়ার সঙ্গে অনশনে একে একে সংহতি প্রকাশ করতে যান। ৫ নভেম্বর ৭ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে সারা দেশে পালিত হয় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। ১১ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে ৭ দলীয় ঐক্যজোট একতরফাভাবে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ওই ঘোষণায় ২০ নভেম্বর সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ২৮ নভেম্বর সচিবালয়ের চারদিকে অবস্থান ধর্মঘটের আহ্বান জানান। ১৯ নভেম্বর ১৯৮৯ সরকারি দল জাতীয় পার্টি ঢাকায় আয়োজন করে এক হরতালবিরোধী মিছিল। এতে এরশাদও অংশগ্রহণ করেন।

৮ দলীয় জোটনেত্রী শেখ হাসিনা ২৯ নভেম্বর ১৯৮৯ জনগণের প্রতি আহ্বান জানান, সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতাল পালনের। খালেদা জিয়াও ২৯ নভেম্বর পূর্ণদিবস ও ৩০ নভেম্বর অর্ধদিবস হরতাল পালনের আহ্বান জানান। ৩০ নভেম্বর হরতাল পালন শেষে বিকেলে আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় কে বা কারা হাতবোমা নিক্ষেপ করে। এতে একজন নিহত ও ১২ জন মারাত্মকভাবে আহত হন।[৫০]

২০ ডিসেম্বর (১৯৮৯) ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট সারা ঢাকায় আয়োজন করে এরশাদ সরকার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল। এরপরেই ক্রমান্বয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন গতিময়তা পেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সাল

১৯৯০ সালের শুরু থেকেই বিরোধী দলগুলোর সরকার বিরোধী গণআন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। প্রতিটি সভা ও সমাবেশ মিছিলে ছাত্র-জনতা তথা আপামর জনসাধারণের চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। আন্দোলনের উত্তেজনা ক্রমেই বহ্নিশিখার মতো বেড়ে উঠতে শুরু করে। প্রধান ৩টি জোটসহ দেশের ছোটখাটো সব দল আন্দোলনের একই কর্মসূচি পালন করতে শুরু করে। এ আন্দোলনের গতিরোধ করার মতো শক্তি এরশাদের ছিল না। বিরোধী দলগুলোর আন্দোলন চলতেই থাকে।[৫১]

১০ জানুয়ারি ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ৯টি ছাত্রসংগঠন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও তথ্য প্রচারের দাবিতে রেডিও-টেলিভিশন ভবন ঘেরাও ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ৩ ফেব্রুয়ারি এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে আওয়ামী লীগ উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে। ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৯০) ৭ ও ৫ দলীয় জোট উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করে।

পুনরায় ১৯৯০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ছাত্রলীগ নেতা চুন্নু নিহত হয়। এ ঘটনার অজুহাতে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৯০) ৮ দলীয় জোটের আহ্বানে ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ৭ এপ্রিল দীর্ঘ ৪০ দিন বন্ধ রাখার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হয়। ৭ মে ১৯৯০ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ স্বৈরাচার বিরোধী এক বৃহত্তম কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ২৮ জুন তারিখে এরশাদ সরকারের ঘোষিত বাজেটে কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারাদেশে পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল। ১২ জুলাই ১৯৯০ এরশাদ বিরোধী দলীয় নেতাদের আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানায়। ১৩ জুলাই বিরোধী দলগুলো এরশাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৫২]

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন মহল থেকে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও ৮ দলীয় ঐক্যজোট নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি ও ৭ দলীয় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি পরামর্শ দেয়া হয় এক মঞ্চ থেকে যৌথভাবে এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য। ৭ দলীয় জোটনেত্রীও মঞ্চে ঐক্যর কথা বলেন। ৮ দলীয় জোটনেত্রী বলেন, মঞ্চের প্রয়োজন নেই, রাজপথের ঐক্য স্বৈরাচারের পতন ঘটাবে।[৫৩]

সেপ্টেম্বর ১৯৯০-এর শেষের দিকে ডাকসুর উদ্যোগে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এ কনভেনশন থেকে 'ডাকসু' এরশাদ সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করলে সারাদেশে সরকার বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়ে ওঠে। একই গণতন্ত্রমনা সব ছাত্র সংগঠনের মধ্যে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী মনোভাব সম্প্রসারিত হয়। অতঃপর ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি আমানউল্লাহ আমানের নেতৃত্বে আওয়ামী সমর্থক ছাত্রলীগসহ অন্য গণতন্ত্রমনা ও স্বৈরাচার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

১০ অক্টোবর ১৯৯০ তারিখে ছিল ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটগুলোর সচিবালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি। এ ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে সচিবালয় ও মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় পুলিশ ছাত্র-জনতা এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলিবর্ষণ করা হয়। এ সংঘর্ষে উল্লাপাড়া কলেজের জেহাদসহ ৫ জন নিহত এবং এক পুলিশসহ ৩ শতকের ও বেশি ছাত্র-যুবক আহত হয়।[৫৪] এদিনই ২২টি ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে আন্দোলন পরিচালনার ঘোষণা দেয় এবং এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহূত হয় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ১১ অক্টোবর ১৯৯০ পালিত হয়। এদিন সকাল ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের একটি মিছিল শাহবাগ মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ তাদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে ডাকসুর প্রথম সারির বেশ কয়েকজন নেতাসহ শতাধিক ছাত্রনেতা ও কর্মী আহত হয়। পুলিশের এহেন নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৩ অক্টোবর ১৯৯০ ঢাকায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। ওই ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মনিরুজ্জামান মনিরসহ ২জন ছাত্র নিহত ও ২৫জন আহত হয়। মনিরুজ্জামানের লাশ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশ ঘটে। ছাত্রদের সমাবেশ সমাপ্ত হবার পর সরকারের কতিপয় সশস্ত্র গুন্ডা মাস্তান বাহিনী আণবিক শক্তি কমিশনের ক্যাম্পাসে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর করে এবং ঢাকার অন্যান্য স্থানেও ভাঙচুর এবং ত্রাস সৃষ্টি করে। এ অজুহাতে এরশাদ সরকার এক অধ্যাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।[৫৫]

১৪ অক্টোবর ১৯৯০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে বহু ছাত্র আহত হয়। এদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণাকে স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী বলে অভিহিত করা হয়। ঢাকায় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে ১৫ অক্টোবর পালিত হয় অর্ধদিবস হরতাল।

Dhaka University Institutional Repository

ওইদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়। ওইদিনই ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা এবং ওই সভায় ছাত্ররা ১৫ দিনব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। অপরদিকে ৮, ৭ ও ৫ দল এরশাদ সরকারের পতনের আন্দোলনে ঐক্যর প্রশ্নে অভিন্ন মত ব্যক্ত করে পৃথক বিবৃতিতে এরশাদ সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্য ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে ১৬ অক্টোবর সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়।[৫৬] ওইদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে রেললাইন উৎপাটন, অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক ভাঙচুর, ব্যারিকেড স্থাপন ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়। চট্টগ্রামে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। বিভিন্ন মঞ্চ থেকে ৮ ও ৭ দলীয় জোট নেতারা এরশাদ সরকারের উৎখাতের আন্দোলনে সবাইকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান।

১৭ অক্টোবর ১৯৯০ তারিখে এরশাদ সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। আহত ছাত্র নেতারা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এরশাদ সরকরের পতনের লক্ষ্যে পুনরায় দৃপ্ত শপথ ব্যক্ত করেন। এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য, ঢাকার জিরো পয়েন্টে কালো পাতাকা উত্তোলন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ২০ অক্টোবর পুনরায় ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় ছাত্রদের। ২২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ। নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলো দেয়ার সিদ্ধান্ত জানায় এবং ওই সমাবেশে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করা হয়। [৫৭]

৮, ৭ ও ৫ দলের আহ্বানে ২৩ অক্টোবর ১৯৯০ সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ও উপজেলা ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয়। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে ৩ শতাধিক ছাত্র-জনতা এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মী আহত হয়। ২৪ অক্টোবর ১৯৯০ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বেঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের অধ্যাদেশ চ্যালেঞ্জ করে আবেদন পেশ করা হয়। আদালত এ ব্যাপারে সরকারের ওপর কারণ দর্শানোর রুলনিশি জারি করে। ৩টি ঐক্যজোটের আহ্বানে ২৭ অক্টোবর সারাদেশে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্যদিকে নিয়ে আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য স্বৈরাচার এরশাদ এক কুটিল খেলায় মেতে ওঠে। ভারতের 'বাবরি মসজিদ' ইস্যুকে কেন্দ্র করে তার

Dhaka University Institutional Repository

গুন্ডা বাহিনীর সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের আক্রমণ, দোকানপাট, বাড়িঘর, উপাসনালয়, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করার মাধ্যমে সাম্প্রাদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে থাকে এবং এ অজুহাতে সরকার ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করে ৩১ অক্টোবর ১৯৯০ তারিখে।

সরকারের এ হীন চক্রান্ত বুঝতে পেরে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট অভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করে এবং আয়োজন করে জনসমাবেশ ও শান্তি মিছিলের। সকলে মিলে মিশে সরকারের হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেয়।[৫৮]

১ নভেম্বরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আহ্বানে ৪ নভেম্বর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মিছিলসহ গোলাপ শাহ মাজার এলাকায় একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিনও পুলিশি হামলা চলে মিছিল ও সমাবেশে। ৫ নভেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলের আহ্বানে দেশে রেডিও-টেলিভিশনে বস্তুনিষ্ঠ সঠিক খবর ও তথ্য পরিবেশনের দাবিতে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় সভা সমাবশ।[৫৯] ওইদিনই সারাদেশে মেডিকেল ডাক্তাররা ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট পালন করে।

৮ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ সংক্রান্ত নতুন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবিতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক ছাত্র সমাবেশ করে মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেলে পুলিশ বাধা দেয় এবং সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ১০ নভেম্বর ১৯৯০ সালে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের আহবানে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। ১১ নভেম্বর ১৯৯০ সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে ছাত্র শিক্ষকরা যৌথভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়। ছাত্র-শিক্ষকের এ যৌথ উদ্যোগ চলমান আন্দোলনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে অনেকের মতে উপরোক্ত ঘটনার পর থেকেই শুরু হয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবীদের অসহযোগ কার্যক্রম।[৬০]

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে ১২ নভেম্বর ১৯৯০ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও এরশাদকে উৎখাতের আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাহলো এরশাদ সরকারের পতন।

১৭ নভেম্বর ছিল 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যর সারাদেশে গণদুশমন প্রতিরোধ দিবস পালনের আওতায় ছাত্রদের ঢাকার মন্ত্রী পাড়া ঘেরাওয়ের কর্মসূচি। ওইদিন সরকারের ভাড়া করা কিছু

Dhaka University Institutional Repository

লোক ঢাকায় ১১টি স্থানে সভার আয়োজন করলে, ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিরোধের মুখে তারা টিকতে পারেনি। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে।[৬১]

১৮ নভেম্বর তারিখে ১৯৯০ সরকারের গুন্ডা মাস্তান বাহিনীর একটি দল পুলিশের ছত্রছায়ায় ঢাকার রায়েরবাজারে আওয়ামী লীগের একটি মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। এতে অনেকে আহত হয়। ১৯ নভেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোটের আহবানে সারাদেশে অর্ধদিবস হরতাল ও সভা সমাবেশ কর্মসূচি পালিত হয়। হরতালের সমর্থনে দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত মিছিলসমূহে সরকারি গুন্ডা, মাস্তান ও পুলিশের হামলায় আহত হয় ২ শতকেরও বেশি লোক। ওইদিন বিকালে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট পৃথক জনসমাবেশ থেকে ঘোষণা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা।

৩ জোটের প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ওই ঘোষণায় বলা হয়। '(১) হত্যা, ক্যু, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে :

ক. সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী তথা সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদের ৩নং ধারা অনুসারে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত ৩ জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করত : রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উপরাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হতান্তর করবেন।

খ. এ পদ্ধতিতে ওই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম সংসদে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

২. ক. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা সাংসদ পদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো মন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

খ. অন্তর্বর্তীকালীন এ সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরেপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাশ করবেন।

গ. ভোটাররা যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই আস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ঘ. গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনসহ সব রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সব রাজনৈতিক দলের প্রচার প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এ সংসদের কাছে সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৪. ক. জনগণের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশের সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে। এবং অসাংবিধানিক যেকোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধান বহির্ভূত কোনো পন্থায়, কোনো অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

খ. জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে এবং প্রয়োগ করতে পারেন সেই আস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

গ. মৌলিক অধিকার পরিপন্থী সব আইন বাতিল করা হবে। [৬২]

৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয়ের আহ্বানে ২০ নভেম্বর ১৯৯০ সারাদেশে সর্বাত্মক সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে সরকারি দলের যুব সংহতি ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এতে সারাদেশে ছাত্ররা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

২১ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় ঘোষণা করে ১১ ডিসেম্বর ১৯৯০ পর্যন্ত অভিন্ন কর্মসূচি। ওইদিন সারাদেশে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ ঘটে।[৬৩] ২২ নভেম্বর ১৯৯০ পুলিশ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। ২৩ নভেম্বর ঢাকায়

Dhaka University Institutional Repository

বিএনপির মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ২৪ নভেম্বর পুলিশ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যর মিছিলে লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

২৫ নভেম্বর তারিখে এরশাদ সরকারের ভাড়া করা ছাত্রনেতা গোলাম ফারুক অভির নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র মাস্তানরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যর মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। মাস্তানদের সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্রদের লড়াই এক ভয়াবহ রূপ নেয়। বহু ছাত্র এতে গুলিবিদ্ধ হয়। ওইদিনই গোলাম ফারুক অভিসহ আরও ৬জন ছাত্রনেতাকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

২৬ নভেম্বর ও এরশাদের সশস্ত্র মাস্তান বাহিনী সন্ত্রাসী হামলা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এতে অনেক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অব্যাহত সন্ত্রাসের সময় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় আন্দোলনকারী শ্রমিক জনতা ও বিভিন্ন পেশার মানুষ ও ছাত্রদের সহায়তা করার জন্য ক্যাম্পাসে ছুটে আসেন। অতঃপর ওইদিন সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যর পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

২৭ নভেম্বর ১৯৯০ ভোরে পুলিশ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন যুবলীগের সভাপতি মোস্তফা মহসিনের বাসা ঘেরাও করে তাকে গ্রেফতার করে। ওইদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরসহ বুয়েটেও ছাত্র বিক্ষোভ ও মিছিল চলতে থাকে। এরশাদের সশস্ত্র মাস্তানরা ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায়। এতে ৩ জন ছাত্র গুলিবদ্ধ হয়। পরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অভি-নীরুর মাস্তানরা টিএসসিতে মিছিলের ওপর সকাল সাড়ে ১১টার সময় গুলি চালায়। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা ও বাংলাদেশ মেডিকেল সমিতি (বিএমএ) এর তৎকালীন মহাসচিব ডা: মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন এবং যুগ্ম সচিব ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের তরুণ শিক্ষক ডা: শামসুল আলম খান মিলন একত্রে একটি রিকশায় টিএসসি অতিক্রম করছিলেন। রিকশাটি টিএসসি অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে অভি-নীরুর মাস্তানদের বুলেট ডা. মিলনের পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়। হাসপাতালে নেয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ছাত্র, শিক্ষক ও ডাক্তারসহ সব পেশাজীবী মানুষ ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় নেমে পড়েন। ডা. মিলন হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সারাদেশে ছাত্র-জনতার এরশাদ বিরোধী অন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালের শিক্ষক ও ডাক্তাররা একযোগে পদত্যাগের ঘোষণা দেয়।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে এরশাদ ওইদিন সন্ধ্যায় এক রেডিও টিভির ভাষণে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। দেশে জরুরি আইন ও ঢাকা শহরে কার্ফ্যু জারি করা হলে ও ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ থামেনি। জরুরি আইন উপেক্ষা করে মিছিল সমাবেশ বাড়তে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ছাত্ররা হল ছাড়লো না। শিক্ষকরা পদত্যাগ করার এবং আইনজীবীরা কোর্ট বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ডাক্তাররা এরশাদ সরকারের অধীনে কাজ না করার সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখেন। এদিন সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ রাখা হয়।

২৮ নভেম্বর ১৯৯০ পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। জরুরি আইন ও কার্ফ্যু ভঙ্গ করে ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক-জনতা পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা নামলেন বিক্ষোভ মিছিলে। ঢাকার মালিবাগে রেলপথ বন্ধ করে দিল শ্রমিক-জনতা। ডেমরার দিকে সংঘর্ষ হলো শ্রমিক-জনতা এবং পুলিশ ও অনান্য সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে। এসব স্থানে গুলিবর্ষণে প্রাণ হারায় ৪ জন। ময়মনসিংহে গুলি চালানো হলো জনতার ওপর। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীতেও পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সংঘর্ষে বহু লোক আহত হয়। ওই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপান এরশাদ সরকারের দেশে জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত আইন জারির কঠোর সমালোচনা করে।

২৯ নভেম্বর ১৯৯০ তারিখে সারাদেশে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোট এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে পালিত হয় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে কারফিউ উপেক্ষা করে বিক্ষোভ মিছিল চলতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে ভাড়াটে মাস্তান ও সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হয় অনেকেই। গ্রেফতার করা হয় অনেক ছাত্র-জনতাকে এবং সরকার সেনাবাহিনীকেও পুলিশ ও বিডিআরের পাশাপাশি মোতায়ন করেন। [৬৫]

৩০ নভেম্বর ১৯৯০ সকাল থেকেই উত্তাপ আর উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সেদিন ছিল শুক্রবার। ঢাকার জরুরি অবস্থা উপেক্ষা করে নেতাকর্মীদের পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষ বায়তুল মোকাররম মসজিদ প্রাঙ্গণে জড়ো হয়ে জুমার নামাজের পর শহীদদের স্মরণে গায়েবানা জানাজার পর জনগণ মিছিল করে অগ্রসর হতে থাকলে সরকারের সশস্ত্র বাহিনী মিছিলে হামলা চালায়। ওইদিন ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশের আয়োজন করে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। স্বনামধন্য কবি ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামালের

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে শত শত নারী রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে। স্বৈরশাসক এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে দেশের অনান্য প্রধান শহরগুলোতেও হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী, ছাত্র, শ্রমিক, জনতা বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে।

৮, ৭, ৫ দলীয় জোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী, ছাত্র-জনতা বিভিন্ন পেশার লোক এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু লোক নিহত ও আহত হয়। ঢাকা শহরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য শহরের সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ দারুনভাবে বিঘ্নিত হয়। দেশের এহেন পরিস্থিতিতে সরকারের জাতীয় পার্টির সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ডা. এম এ মতিন ও অপর ৩ জন মন্ত্রীসহ ১৯ সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন।

যদিও ২ ডিসেম্বর ১৯৯০ দেশে কোনো হরতাল ছিল না। তথাপি ঢাকার বিভিন্ন পাড়া ও মহলায় ছাত্র-জনতার খন্ড খন্ড বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শিত হয়। এদিকে 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের' এক সমাবেশে রেডিও ও টেলিভিশনের সংবাদ পাঠক ও ঘোষকদের একটি কালো তালিকা ঘোষণা করা হয়। এদিন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আইনজীবীদের এক সমাবেশে এরশাদকে খুনি ও অবৈধ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ঢাকায় সর্বত্র প্রচার ও বিতরণ করা হয় 'বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারদিকে' শিরোনামে গণঅভ্যুত্থানের বুলেটিন। সারাদেশে বিক্ষোভ চলতে থাকে এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে।

সারাদেশে ৩ ডিসেম্বর ১৯৯০ তিনজোট ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যর আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। সরকার বিধিনিষেধ শিথিল করা সত্ত্বেও এদিনও সাংবাদিকরা পত্রিকা প্রকাশে অনীহা ব্যক্ত করেন। হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মী বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র-শ্রমিক জনতার বিক্ষোভ মিছিল সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এদিন বিসিএস (প্রশাসনিক) ক্যাডারের ২০৫ সদস্য পদত্যাগ করার কথা ঘোষণা করেন। সরকারের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করা ৫৮টি এনজিও সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। জাতিসংঘের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ঢাকায় জাতিসংঘের সব কার্যক্রম ও দফতর বন্ধ ঘোষণা করা হয়। চট্টগ্রামে ১ জন ও চাঁদপুরে ১ জন নিহত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে চাঁদপুরের ডেপুটি কমিশনার পদত্যাগ ঘোষণা করেন। রাতে এরশাদ এক রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোয়নপত্র দাখিলের ১৫ দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেয়ার কথা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করেন। ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যর নেতারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এরশাদের এ প্রস্তাব।[৬৬]

৪ ডিসেম্বর ১৯৯০ সকালে লাখ লাখ রাজনৈতিক নেতাকর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী লোক সংগঠনসমূহের নেতাকর্মী এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন রাস্তা ভরে ওঠে। সারাদেশে বিভিন্ন শহরে ও গঞ্জে এরশাদের ভাঙা ও কুশপুত্তলিকা দাহের ঘটনা ঘটে ব্যাপক হারে। এদিন ঢাকায় সিভিল সার্ভিস সমন্বয় পরিষদের সদস্যরা সচিবালয় ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে ছিলেন বিসিএস, (প্রশাসন) ক্যাডারের কমকর্তা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। এদিন বিকালে ৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটত্রয় ঢাকায় পৃথক পৃথক সমাবেশে এরশাদের আগের দিনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে তখনি তার পদত্যাগ দাবি করে। 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' নেতারাও একই দাবি জানায়।[৬৭] ৪ ডিসেম্বর রাত ১০ টার সংবাদের সময় এরশাদ সাহেবের অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এ সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে জরুরি অবস্থার আইন ও কারফিউ উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ আনন্দ-উল্লাসে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং গভীর রাত পর্যন্ত চলে হাজার হাজার মানুষের বিজয় মিছিল।[৬৮]

৫ ডিসেম্বর ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট সর্বসম্মতভাবে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করে। এদিন এরশাদ চতুর্থ সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন।

৬ ডিসেম্বর সকালে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। তারপর এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। অতঃপর দীর্ঘ প্রায় ৯ বছরের স্বৈরশাসনের পতন ঘটে।[৬৯]

এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের এ পতনের মূলে ছিল, ৩ জোট (৮, ৭ ও ৫) বা দলের প্রত্যক্ষ ভূমিকা। এ আন্দোলনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ এতই ব্যাপক ছিল যে, পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীর সদস্যরা পিছু হটতে শুরু করে। সেনাবাহিনীও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

এভাবে এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলগুলো ছাত্র-জনতার সহায়তা ও সমর্থনে ধারাবাহিক প্রতিবাদ ও আন্দোলন চালিয়ে স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামল অতিবাহিত করে এবং পরিশেষে এরশাদের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. দৈনিক দেশ-ঢাকা, ১৪ এপ্রিল ১৯৮২।

২. মোহাম্মদ খোশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস; এরশাদের সময়কাল; স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-২

৩. মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, কাকলি প্রকাশনী, ১৯৯৭-পৃষ্ঠা-৭১-৭২।

৪. মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, কাকলি প্রকাশনী, ১৯৯৭,পৃষ্ঠা-৭২।

৫. দৈনিক ইত্তেফাক ২২ নভেম্বর ১৯৮২।

৬. ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৪৫।

৭. ইউসুফ মোহাম্মদ সম্পাদিত অ্যালবামঃ গণআন্দোলন-১৯৯২ ১ম খন্ড তোলপাড়, চট্টগ্রাম, ১৯৮২-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩১৬।

৮. আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রীত্বের নয় মাস, ঢাকা, ১৯৮৮ পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫।

৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ৩ এপ্রিল, ১৯৮৩ ঢাকা।

১০. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ এপ্রিল, ১৯৮৩ ঢাকা।

১১. ড. এমএ ওয়াজেদ মিঞা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৭।

১২. দৈনিক সংগ্রাম; ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৩-ঢাকা।

১৩. ড. এমএ ওয়াজেদ মিঞা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪৭-৩৪৮।

১৪. ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২।

১৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮৪-ঢাকা।

১৬. এম ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৪৯।

১৭. দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৮৪, ৩ এপ্রিল, ঢাকা।

১৮. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, ২ মে, ১৯৮৪, ঢাকা।

১৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ মে ১৯৮৪, ঢাকা।

২০. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক বাংলার বাণী, ৬ জুন থেকে ১ সেপ্টেম্বর ।

২১. ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৩।

২২. ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. দৈনিক ইত্তেফাক ১৫ এপ্রিল, ১৯৮৫ ও ড. মুহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭।

২৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ২ মার্চ, ১৯৮৫-ঢাকা।

২৫. আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রিত্বের নয় মাস, নওরোজ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-১৪৬।

২৬. ড. হারুন-অর-রশিদ, প্রাগুক্ত, ৩২৪, হাসিনা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩২৪।

২৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪ জুলাই, ১৯৮৫ ঢাকা।

২৮. দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ আগস্ট, ১৯৮৫।

২৯. ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৬।

৩০. দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ মার্চ, ১৯৮৬ ঢাকা।

৩১. মো, খুশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস; এরশাদের সময়কাল, স্টুডেন্ট ওয়েজ পৃষ্ঠা-৪০-৪৩।

৩২. দৈনিক ইত্তেফাক ৫ মে, ১৯৮৬ ঢাকা।

৩৩. জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা-৯৮-১৯৯।

৩৪. জালাল ফিরোজ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৯।

৩৫. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, প্রাগুক্ত, আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭৬।

৩৬. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, প্রাগুক্ত, আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৪, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭৭।

৩৭. দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ অক্টোবর, ১৯৮৬।

৩৮. দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ জুলাই, ১৯৮৭, ঢাকা।

৩৯

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া , প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৬৭।

৪০. আবু নাসের টুকু, রাখী বর্মণ , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮২।

৪১. মোস্তাফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৬।

৪২. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৮৮।

৪৩ ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের ক্রমবিকাশ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৩৪১।

৪৫. মুহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখী বর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮২, দৈনিক সংবাদ, ৮-১৩ জুন ঢাকা।

৪৬. দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।

৪৭. ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, ৩৭২।

৪৮. দৈনিক সংগ্রাম ২৯ জুন ,ঢাকা ১৯৮৯।

৪৯. ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া; প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৭২।

৫০. মোহাম্মদ আবু নাসের টুকু, রাখী বর্মণ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৮২-১৮৩।

৫১. মোস্তফা কামাল প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭।

৫২. ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭৫।

৫৩. ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭৫।

৫৪. ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬২-১৬৩।

৫৫. সাপ্তাহিক ছুটি, বর্ষ ৬ সংখ্যা ৪০, ১৯ অক্টোবর, ঢাকা ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১১।

৫৬. মোস্তফা কামাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯১।

৫৭. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদিত), গণআন্দোলন, ১৯৮২-৯০ মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৬৮।

৫৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আবুল হাসানাত (সম্পা.) ৯০-এর গণঅভ্যুত্থান মুক্তধারা ঢাকা ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৩০।

৫৯. মোহাম্মদ খুশবু , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৬।

৬০. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক খবর, দৈনিক সংগ্রাম, ৯-১২ নভেম্বর ১৯৯০।

৬১. ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭০।

৬২. দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলার বাণী, ঢাকা, ২০ নভেম্বর ১৯৯০।

৬৩. এমাজউদ্দিন আহম্মদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, শেখ মোঃ ইসমাইল হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৬১-৬৬।

৬৪. মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, স্বৈরশাসনের নয় বছর ১৯৮২-৯০, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা-১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৬১-১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ নভেম্বর ১৯৯০ ঢাকা।

৬৬. ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫৫।

৬৭. আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা-১৯৯১, পৃষ্ঠা-২৭৬।

৬৮. তমিজউদ্দিন আহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭।

৬৯. Talukdar Moniruzzaman, Politics and Sceurity of Bangladesh, University Press Ltd. Dhaka. 1994, P. 143.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা পর্যালোচনা :

পর্যালোচনা পূর্ববর্তী আলোচনায় এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা অর্থাৎ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কিভাবে কোন কোন সময় এরশাদ বিরোধী কার্যকলাপ সম্পন্ন করে আন্দোলন করে, প্রতিবাদ করে, সর্বোপরি ছাত্র, পেশাজীবী, আপামর জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যে গণআন্দোলন পরিচালনা করে এবং নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটাতে সক্ষম হয় তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বিরোধী জোট ও দলসমূহের ওই ভূমিকা বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা উপস্থাপন করবো :

৪.ক. গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াশে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা :

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৮২-১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশে সংঘঠিত গণআন্দোলন নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। সুদীর্ঘ ৯ বছরব্যাপী পরিচালিত ওই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে।

লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কর্তৃক ক্ষমতা ছিনতাই তার ঔদ্ধত্য কার্যকলাপে প্রথমেই জনমনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। রাজনীতিতে ধ্বংসের চক্রান্ত, ছাত্র-জনতার ওপর অমানসিক নির্যাতন, সামরিক জান্তার অবাধ লুটপাট, ব্যক্তি স্বাধীনতা রুদ্ধ, দুর্নীতি, গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংসের অশুভ পাঁয়তারা দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারেনি এদেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। জনগণের হৃতঅধিকার পুনরুদ্ধারকল্পে এ সময় রাজনীতির স্বাপদ সংকুল পথে পা বাড়ালেন প্রধান রাজনৈতিক ২টি দলের নেতারা এবং শক্তভাবে রাজনীতির হাল ধরলেন। পাশাপাশি অন্যান্য সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে জোট গঠন করে এরশাদ বিরোধী যুগপৎ আন্দোলন চলিয়ে যেতে থাকেন। স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তন এবং গণতন্ত্রের জন্য পরিচালিত জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি এ সময়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের স্ব স্ব দাবিতে প্রবল আন্দোলন হয়েছে। শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ এবং পেশাজীবী সর্বস্তরের মানুষই এ সময়ে তাদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে নেমেছে। এরশাদ বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে শিল্পি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা ও বিশেষ তাৎপর্যপূণ ভূমিকা পালন করেছে। সাংবাদিকরা লেখা ও বলার মাধ্যমে যেমন বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তেমনি তারা সময়ের ডাকে রাজপথে নেমে জনতার কাতারে যোগ দিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এর আগের কোনো আন্দোলনে পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা এভাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও একযোগে পদত্যাগ করেছেন। চিকিৎসকরা এ আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। সাংবাদিকরা সত্য সংবাদ গোপন করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দিনের পর দিন সংবাদপত্র বন্ধ রেখেছেন। শিক্ষকরা মিছিল করেছেন আইনজীবীরা আগাগোড়া অনমনীয় ছিলেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সংস্কৃতিকর্মিরা পুলিশের হুমকি উপক্ষো করে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে একসঙ্গে সংগ্রাম করেছে। মহিলারা দ্বিধা করেননি মিছিল করে স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে। প্রশাসন ভবন ছেড়ে সরকারি কর্মচারীরা রাস্তায় বের হয়ে এসেছে। সর্বোপরি এ আন্দোলনে ছাত্ররা ছিল অগ্রণী ভূমিকায়। রাজনৈতিক নেতারা এক সময় যা পেরে ওঠেনি তা ছাত্ররা পেরেছে। দলীয় ভেদাভেদ অন্তর্কলহ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের ঐক্যচাপ সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক জোট নেতাদের ওপর ও প্রভাব ফেলেছে আপামর জনগণের ওপর। সর্বোপরি সবার ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চাপ মূলত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. খ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটের ভূমিকা :

১৯৮২-১৯৯০ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক ও স্বৈরশাসক এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কখনো এককভাবে এবং অধিকাংশ সময় জোট গঠন করে এ ভূমিকা পালন করেন। বিরোধী দলগুলো এক মুহূর্তের জন্যও আন্দোলনের মাঠ ত্যাগ করেননি ও রাজপথ ছাড়েননি। স্বৈরাচারের সঙ্গে আপস করেননি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রামের আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছে। দিশেহারা জাতিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। স্বৈরাচার এরশাদের পতনে তাদেরই সুযোগ্য নেতৃত্বে জনতার ধূমায়িত ক্ষোভ প্রজ্বলিত শিখায় পরিণত হয়েছে। এ দেশের সংগ্রামী জনগণ তাদেরই নেতৃত্বে বিপন্ন জাতিকে পতনের শেষ ধাপ থেকে উদ্ধার করেছে। আন্দোলনের আপসহীন নেত্রীদ্বয়কে বার বার গৃহবন্দি করে রেখেছে কিন্তু তাতেও আন্দোলন দমন করতে পারেনি।

মূলত : ৭ দল ও ৫ দলীয় জোটের সমঝোতার ভিত্তিতে স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। ৩ জোটের যুগপৎ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। ৩ জোটের যুগপৎ আন্দোলনের মধ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপির অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও ২ দলের মধ্যে যখন কোনো সমঝোতা হয়েছে তখন গণতন্ত্রের সংগ্রাম বেগবান হয়েছে। এরশাদের ক্ষমতা দখলের শুরুর দিকে শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রথম ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং আন্দোলনের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারিতে মওলানা মান্নানের নেতৃত্বাধীন জামায়েতুল মোদাররেছিনের এক সভায় এরশাদের একটি উস্কানিমূলক ভাষণের প্রতিবাদে দ্রুত আওয়ামী লীগসহ ১৫টি রাজনৈতিক দলের একটি যুক্ত বিবৃতি দেয়ার মধ্যদিয়ে ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের উদ্ভব ঘটে। এরপর বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। পরবর্তীতে চলতি রাজনীতির প্রেক্ষাপটের আশু ও জরুরি দাবি হিসেবে ১৯৮৩ সালের ৬ সেপ্টম্বর ১৫ ও ৭ দলীয় জোটের সমঝোতার ভিত্তিতে ২টি ভিন্ন মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয় ৫ দফার অভিন্ন কর্মসূচি। এ ৫ দফা দাবি বিরোধী রাজনৈতিক জোটকে আন্দোলনের গতিময়তা আনতে সাহায্য করে। দাবিগুলো ছিল :

(সংক্ষিপ্তভাবে)

১. অবিলম্বে সামরিক আইনের শাসন প্রত্যাহার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. অবিলম্বে দেশে জনগণের সব মৌলিক অধিকারসহ গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে সব বিধিনিষেধ তুলে নিতে হবে।

৩. নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে দেশে অন্য যে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সংবিধান সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল জনগণের নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদেরই থাকবে। অন্য কারো নয়।

৪. রাজনৈতিক কারণে আটক বিচারাধীন এবং সামরিক আইনে দন্ডিত সব রাজনৈতিক নেতা ও কর্মিকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হয়রানী ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে।[১]

৫. ১৯৮৩ সালের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে সংঘটিত ছাত্র হত্যাসহ সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ যাবৎকাল ছাত্র-শ্রমিক রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হত্যার তদন্ত, বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি, নিহত আহতদের তালিকা প্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-ক্ষেতমজুরসহ সকলের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

যুগপৎ আন্দোলনের ধারা সে সময় থেকেই সূচিত হয়। সরকার আন্দোলনের চাপে প্রকাশ্যে রাজনীতির অধিকার ফিরেয়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৮৩ সালের ১ নভেম্বর সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবিতে যুগপৎ প্রথম সফল আন্দোলন হয়। বিরোধী জোটগুলো ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রবল আন্দোলনের ডাক দেয় এবং তাহা বিভিন্ন সময় জটিল রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করে। ২৯ নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও এর মধ্যদিয়ে এমনি এক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। বিরোধী দল ও জোটগুলো ওইদিন সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ অবস্থান ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপলাভ করে। ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে এরশাদ সরকার আন্দোলন প্রশমনের জন্য এবং বিরোধী দলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসার বাহ্যিকভাব প্রদর্শনের লক্ষ্যে ৮ ও ৭ দলীয় জোটের সঙ্গে সংলাপে ব্যর্থ হওয়ার পর সরকার তার খুশিমতো নির্বাচন করতে চাইলে বিরোধী আন্দোলনের অগ্রগতির মুখে তা বাতিল করতে বাধ্য হয়। প্রধান রাজনৈতিক ২টি বিরোধী জোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করলেও কার্যত বাস্তবে তা ব্যর্থ হয়। সরকার পুনরায় ১৯৮৬ সালের ৭ মে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে। ১৫ দল ওই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৭ দলীয় জোট নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে ফলে এতদিনকার যুগপৎ আন্দোলনের একটি পর্ব নিষ্ফলভাবে শেষ হয়ে যায়। এ সময় ১৫ দল ছেড়ে ৫ দল নির্বাচনের বিরোধিতা করে আলাদা হয়ে যায়।

১৯৮৭ সালের গণবিরোধী বাজেট, জেলা পরিষদ বিল প্রভৃতি সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংসদের ভেতরে ও বাইরে আন্দোলনকে ৮ দলীয় জোট কিছুটা জোরদার করে তুলতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ৭

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় ও ৫ দলীয় জোট এ সময় তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। অত্যন্ত তীব্রভাবে সংসদ বাতিলের দাবি তোলে। ওই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৭ সালের জুন-জুলাই মাসে নতুন করে সরকার বিরোধী আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে তা পরিণতিতে এক দফা অর্থাৎ এরশাদ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে অক্টোবর মাস থেকে তা বেগবান হয়। বিরোধী ২ জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়ার যৌথ বিবৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের অঙ্গীকার মানুষের মধ্যে স্বৈরশাসকের পতনের ব্যাপারে আশাবাদী করে তোলে।

অবশ্য পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালের নভেম্বরে এরশাদ বিরোধী এক দফা আন্দোলনের ব্যর্থতার পটভূমিতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক জোট এবং দলগুলোর সমঝোতা ভেঙে পড়েছিল। তখন প্রধান বিরোধী জোটগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কোন্দল, কাদা ছোড়াছুড়ি, ছাত্র সংগঠনগুলোর পাস্পরিক রেষারেষি দেখে মনে হয়েছিল আর বুঝি যুগপৎ আন্দোলন সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৯০ সালের মধ্যভাগে প্রধান বিরোধী ৩ জোটের মধ্যে সমঝোতা গড়ে ওঠে এবং ১০ অক্টোবর ঢাকায় ৭, ৮ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের সচিবালয় অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নতুন অধ্যায়ের অবতরণা হয়। সেদিন থেকেই এ আন্দোলন অব্যাহতভাবে প্রচন্ডগতিতে বেগবান হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য এরশাদ সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে শুরু করে জরুরি আইন, কারফিউ, হত্যাকান্ড, জেল-জুলুম প্রভৃতির পথ গ্রহণ করে। কিন্তু রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সাহসী ও দৃঢ় সংগ্রামের মুখে তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও সমর্থন দিয়ে রাজনৈতিক নেতাকর্মী, ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবীর লোক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের আপামর জনসাধারণ সবাই মিলে এরশাদীয় শাসনের পতন ঘটায় এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে।

পাদটীকা

১. ইউসুফ মুহম্মদ সম্পাদিত, অ্যালবাম : গণআন্দোলন (১৯৮২-৯০) ১মখন্ড তোলপাড়, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪. গ. ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র সমাজের ভূমিকা :

বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে আমাদের দেশের ছাত্র সংগঠনগুলো পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত। ১৯৮২-১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সামরিক ও স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করেন ছাত্ররা এবং তা স্বার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়ে বিজয় অর্জনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখেন তারাই। কিন্তু এরশাদ সরকার দমননীতি ও নানাবিধ ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অবিশ্বাসের জন্মদিলেও পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। সত্যের পথে ছাত্রদেরই জয় হয়েছে। যে বিষয়টি উল্লেখ করার মতো তাহল ছাত্রদের আন্দোলন শুধু ছাত্ররাই করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের আন্দোলনে অবধারিতভাবে ছাত্রসমাজ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে।

এরশাদ সরকারের সামরিক শাসন জারির সঙ্গে সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়নি। সামরিক শাসন জারির পর দেশের রাজনৈতিক মহল নীরব থাকলেও ২৪ মার্চ রাতেই এর প্রতিবাদে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সামরিক শাসন বিরোধী পোস্টার লাগাতে গিয়ে গ্রেফতার হয় অনেক ছাত্র।[১] ২৫ মার্চ ১৯৮২ সকাল ১০ টায় মধুর কেন্টিন থেকে ছাত্ররা প্রথম প্রতিবাদ মিছিল বের করে। মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিণ করে মধুর কেন্টিনেই ফিরে আসে। ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো আক্রান্ত হয়। সেনাবাহিনী হলগুলোতে ছাত্রদের ওপর শক্তির তান্ডব চালায়।

প্রকৃতপক্ষে ছাত্র সংগঠনগুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে ১৯৮২-এর এপ্রিল মে মাস থেকেই। ১৯৮২ জুন প্যালেস্টাইন সংহতি দিবসে সামরিক শাসনের কড়া নিরাপত্তা ভেঙে ছাত্ররা বায়তুল মোকাররমের এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করে। [২]

মূলত : ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্ররা বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের উপায় খুঁজতে থাকে। এ সময় বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ফরহাদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের একটি পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনেতিক মহলে পেশ করেন। তিনি সেটি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের কাছে পৌঁছে দেন। এরা বৃহত্তর ছাত্র ঐক্যের জন্য তাদের উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ দেন।[৩] এরপর ১৪টি ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হয়। ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ কার্যালয় ব্যবহৃত হতে থাকে। স্বৈরাচারীর

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষকরা ১৯৮২-এর ১৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে, শ্রেণীকক্ষে প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্রকে তখন গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। সব ধরনের নির্যাতন উপেক্ষা করে ছাত্ররা জে. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

সামরিক সরকারের ধর্ম ও শিক্ষামন্ত্রী ড. মজিদ খান গণবিরোধী শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। ১৪টি ছাত্রসংগঠন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। এতে সংশিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়। গণস্বাক্ষর অভিযানের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মাঝে সারাদেশে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকে। ছাত্র সংগঠনগুলোর বিভিন্ন কর্মসূচির সমর্থনে কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ ছাত্ররাও একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের পাশে থেকে।[৪] ১৯৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষাভবন ঘেরাও কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্ররা প্রথম ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষাভবন ঘেরাও আন্দোলনে জাফরসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হলে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা বেড়ে যায়। ১৯৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর সরকার একতরফাভাবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে ছাত্র নেতারা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০ দফা প্রণয়ন করে।[৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ২৪ মার্চ ১৯৮৩ তে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। ওই সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ দফা ঘোষণা করা হয়। ১০ দফা দাবিগুলো হচ্ছে- ১. মধ্য ফেব্রুয়ারির ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করা। ২. মজিদখানের গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে। ৩. সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ৪. শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন ৫. খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাতে দাম কমাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় খাতে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। ৬. মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হবে। ৭. বিরাষ্ট্রীকরণনীতি প্রত্যাহার করতে হবে এবং সরকারি খাতকে লাভজনক করতে হবে। ৮. সরকারি ও বেসরকারি কাজে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ৯. অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে। ১০. সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীতি বাতিল করে স্বাধীন ও জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে।[৬] ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১০ দফা দাবি ঘোষণা করলে ছাত্র আন্দোলন ইস্যুভিত্তিক থেকে দফাভিত্তিক আন্দোলনে রূপ নেয়। ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এরশাদ সরকার ছাত্রদের একটি মিছিলের ওপর ট্রাক উঠিয়ে দিলে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

Dhaka University Institutional Repository

সেলিম এবং দেলোয়ার। এ ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ১৯৮৪ ১ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশে গণআন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৮৫ সালের উপজেলা পরিষদের নির্বাচন প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্ররা এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনকে আরো বিস্তৃত রূপ দেয়। ১৯৮৩-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা দিবস পালনের আহ্বানে ১৯৮৫-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে সূর্যসেন হল থেকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিল বের হয়। জে. এরশাদের নতুন বাংলা ছাত্রসমাজের সশস্ত্র ব্যক্তিরা এ মিছিলে গুলি চালায়। এতে নিহত হয় তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা রাউফুন বসুনিয়া।[৭] এর ফলে দেশব্যাপী গণআন্দোলনের ব্যাপকতা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

১৯৮৬ ও ১৯৮৭ এর রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের আত্মনিবেদিত ভূমিকা এদেশের ইতিহাসে গৌরবজনক অধ্যায়কে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে। ১৯৮২-এরপরে ৯ বছর ব্যাপী আন্দোলন যার তুঙ্গাস্পর্শী পর্যায় ১৯৯০-এর ১০ অক্টোবর থেকে শুরু ছাত্র সমাজের নেতৃত্ব এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৯০-এর ১০ অক্টোবর মিছিল সমাবেশ থেকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিল ৪ জন ছাত্র। গণতন্ত্র চাওয়ার শাস্তি হিসেবে বুলেটবিদ্ধ মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে। ছাত্র হত্যার বর্বরতায় এরশাদ সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেরুখে দাঁড়ায় গোটা ছাত্রসমাজ, গড়ে উঠে রক্ত ছোঁয়া শপথে ২২টি ছাত্র সংগঠনের ঐক্য 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য'। ছাত্রদের এ শপথ ছিল স্বৈরাচারের সমূল উৎখাতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয় সম্পূর্ণ করা।

স্বার্থ ও আদর্শগত সব দ্বন্দ্ব অনৈক্যের পিছুটানের উর্ধ্বে ওঠা এ মহান ঐক্য সরকার বিরোধী আন্দোলনকে টেনে নেয় চূড়ান্ত সাফল্যের শিখরে। ১৯৯০-এর অক্টোবরের সরকার কর্তৃক একের পর এক নির্যাতনে ছাত্র ঐক্য নেতারা আন্দোলনকে আরও বেশি বেগবান করে তোলে। ছাত্রনেতাদের কেনার চক্রান্ত হয়। প্রাণনাশের হুমকি আসে স্বৈরশাসক কর্তৃক। কোনো কিছুতেই বিন্দুমাত্র টলে যায়নি ছাত্র ঐক্য। রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যর অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণতায় সম্পন্ন করে রাজপথে ছাত্র ঐক্যর ইস্পাত কঠিন ঐক্য, আন্দোলনের দৃঢ়তা। কারফিউ চলাকালে গোলপ শাহ মাজারের কাছে ছাত্র ঐক্যর সমাবেশ চরম পুলিশি নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। ছাত্র ঐক্য সব প্রতিকূলতাকে পায়ে দলে ক্রমেই বিকশিত হতে থাকে অপ্রতিহত গতিতে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে এদেশে সর্বকালে শ্রেষ্ঠতম একটি গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ার অবতারণা করে।

Dhaka University Institutional Repository

দুঃশাসনে শ্বাসরুদ্ধ জনতা মুক্তির ঠিকানা খুঁজে পায় ছাত্রঐক্যের মিছিলে। গণঅভ্যুত্থানের ভীত রচিত হয় ছাত্র ঐক্যের ভিত্তিতে। ছাত্র ঐক্যের ক্রমবিকাশমান শক্তিতে ভিত স্বৈরাচার মরিয়া হয়ে লেলিয়ে দেয় অস্ত্রধারী মাস্তান বাহিনীকে। ২৫ নভেম্বর থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের অবিরাম বুলেট বৃষ্টিকে গুঁড়িয়ে দেয় ছাত্র ঐক্যের সকল ছাত্রছাত্রীর সম্মিলিত প্রতিরোধ। কোনো পরাজয় নয় পিছুটান নয়, দ্বিধা নয়- ছাত্র ঐক্য গণআন্দোলনের আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে যায় সব প্রতিকূলতার মাঝে।

২২ টি ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যপরিষদ' বিরোধী তিনটি জোটকে ঐক্যবদ্ধ করে অভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনকে গতিময়ভাবে এগিয়ে নিয়ে স্বৈরশাসনের পতন ঘটিয়ে চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে।

পাদটীকা

১. মোহম্মদ খুশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস : এরশাদের সময়কাল, প্রকাশক মো. লিয়াকত উল্লাহ, স্টুডেন্ট ওয়েজ , ঢাকা-১৯৯১। পৃষ্ঠা-৩।

২. ড. মোহম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এরশাদের সময়কাল, প্রকাশক ওসমান গণি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯০, পৃষ্ঠা-২১।

৩. মো. হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩।

৪. মুহম্মদ খুশবু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১।

৫. ড. মোহাম্মদ হান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১।

৬. ওই পৃষ্ঠা-৪১-৪৫।

৭. মুহম্মদ খুশবু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ঘ. এরশাদ শাসনামলে গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান ১৯৯০ এবং সামরিক ও স্বৈরশাসনের পতন :

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণআন্দোলন শব্দটি অত্যন্ত সুপরিচিত। আর গণআন্দোলনের জোয়ার-ভাটায় এখানে নির্ধারিত হয় রাজনীতির গতিপথ। বাংলাদেশের গণআন্দোলনে ঐতিহাসিকভাবেই গৌরবময় ঐতিহ্যগুলো যেমন : ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণদাবির কেন্দ্রীয়ভবন, স্বাধীনতা অর্জন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি এবং তার সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন কালপর্বে গণআন্দোলন হয়েছে এদেশে। তবে ১৯৬৯ থেকে ১৯৯০ হচ্ছে গণআন্দোলনের স্বর্ণ প্রসাধনী কালপর্ব। এসব গণআন্দোলন জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে কখনো গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করেছে। কখনো তৈরি করেছে প্রতিশ্রুতির।

গণঅভ্যুত্থান : কোনো দেশের ক্ষমতাসীন সরকার যখন তার স্বৈরাচারী কার্যকলাপের মাধ্যমে জনগণ থেকে ক্রমশ বিছিন্ন হয়ে পড়ে তখন ধাপে ধাপে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠন বিছিন্নভাবে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলো একতাবদ্ধ হয় এবং ছাত্র-জনতা, শ্রমিক ও পেশাজীবীসহ আপামর জনগণ সরকার বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের পতনকে অনিবার্য করে তুলে। জনতার দুর্বার আন্দোলনের মুখে সরকার পরিবর্তনকে গণঅভ্যুত্থান বলা হয়।

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে অন্যায় ও অবিচার যখন চরম আকার ধারণ করে, সমাজে যখন পর্বত প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা যখন মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিচালিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বঞ্চিত করে তখনই জনগণ ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ করে। এটাই পৃথিবীর দেশে দেশে গণবিদ্রোহের ইতিহাস। শাসকেরা নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে একে দমনের চেষ্টা করে। তারা মরিয়া হয়ে ওঠে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। শত নির্যাতন ও নিপীড়নকে উপেক্ষা করে জনগণ এগিয়ে আসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। বাংলাদেশের রাজনীতিতে (৮২-৯০) এ সময়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে দৃঢ়ভাবে।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর থেকে যে লাগাতার আন্দোলন ২৭ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়ে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার পটভূমি রচিত হয়েছিল পর্যায়ক্রমিক তিলতিল করে। এক ব্যক্তির ইচ্ছানির্ভর ক্ষমতাকেন্দ্রীকরণের যে ধারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ক্রমেই দৃঢ়মূল হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেছিল। সারা দেশকে দুর্নীতি ও কতিপয় ব্যক্তির লুণ্ঠনের এক অবধারিত ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। অত্যন্ত উলঙ্গভাবে রাজনীতি ও প্রশাসনের সামরিকীকরণ ঘটানো হচ্ছিল এবং সর্বোপরি গোটা দেশের বর্তমানই শুধু নয়, ভবিষ্যত প্রজন্মকে গভীর এক গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল। তাই এক্ষেত্রে বিরোধী দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো অত্যন্ত ধীরগতিতে তৈরি করছিল জনগণের এক সর্বব্যাপী উত্থানের পটভূমি। আর এসব বাস্তব কারণ সমাজে ও রাজনীতিতে উপস্থিত শক্তিগুলোকে বাধ্য করেছিল এ সর্বব্যাপ্ত জনগণের জন্য, জনগণের এ শক্তি ধারণ করার জন্য অন্তত সেই শক্তিকে আপন আপন স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করার জন্য সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হওয়ার এবং পরিশেষে সফলকাম হয়েছে তারা।

১৯৯০-এর গণআন্দোলনের লক্ষ্য : বিরোধী রাজনৈতিক দলের ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের প্রধান প্রধান লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ : ১. স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন। ২. বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ৩. জবাদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা ৪. সংসদের নিকট দায়িত্বশীলমন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা।

১৯৯০-এর গণআন্দোলনের প্রকৃতি : ১৯৯০ সালে বিরোধী রাজনৈতিক জোট, দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর পাশাপাশি জনগণের গণআন্দোলন বিভিন্ন দিক থেকে ছিল বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। ১৯৯০-এ সরকারের পরিবর্তন ঘটে শান্তিপূর্ণভাবে। অতীতে এমন হয়নি। এবার রাজনীতির বিজয় হয়েছে। আন্দোলন শেষে বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলি হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। এ গণ আন্দোলনের রূপরেখা ছিল ভিন্ন। আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল ঐক্যমতের ভিত্তিতে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য হতে শুরু করে দলীয় পর্যায় পর্যন্ত পরিব্যপ্ত ছিল ঐক্যতা। এ আন্দোলনে যতটুকু ছিল প্রত্যাশা তাহার চেয়ে অনেক বেশি ছিল প্রত্যাখ্যান। জেনারেল এরশাদকে প্রত্যাখান। তার স্বৈরশাসনকে প্রত্যাখ্যান সামাজিক দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং তার সহযোগিদের প্রত্যাখ্যানই ছিল এ আন্দোলনের মূল সুর।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত : গণআন্দোলনের সূচনা হয় ঢাকায়- বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। ১৯৯০-এর মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত তা সীমিত থাকে ঢাকা ও দেশের বড় বড় শহরে, উপজেলায় এমনকি ইউয়িন পর্যন্ত। প্রথমে রাজপথ, পরবর্তীতে তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বোপরি জনতার সম্পদে রূপান্তরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬. ১৯৯০-এর গণ আন্দোলনের ঘটনাক্রম ও গণঅভ্যুত্থান পর্যালোচনা :

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর থেকে স্বৈরশাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে সূচনা ২৭ নভেম্বর এসে তা অভ্যুত্থানমুখী হয়ে ওঠে এবং ৪ ডিসেম্বর জে. এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এ ঘটনাবলি আমাদের ইতিহাসের এক অনন্য অধ্যায়। স্বৈরাচারী এরশাদকে হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যে আন্দোলনের সূচনা করেছিল, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তা শেষাবধি গণঅভ্যুত্থান ১৯৯০-এ রূপান্তরিত হয়।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর বিরোধী রাজনৈতিক জোট, দল, ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলনের মাঠে এক অভাবিত গণজোয়ার সৃষ্টি করে। সূচনা পথেই আন্দোলনের প্রকাশ জনতার সংগ্রামের তীব্রতা এক জঙ্গী ও উত্তাল আন্দোলনের সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক জোটগুলোর ১০ অক্টোবর ছিল যুগপৎ আন্দোলনের অবরোধ কর্মসূচি এবং সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট। ৩ জোটের কর্মসূচিকে অনুসরণ করে জামায়াত, ছাত্রদল, জাগপা, কমিউনিস্ট লীগ, ঐক্য প্রক্রিয়া, মুসলিম লীগ এবং আরো কিছু দল ও জোট। সরকার বিরোধী দলের আন্দোলন ঠেকাতে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও বিডিআর দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। তাতেও যখন গণজোয়ার ও বিক্ষোভ ঠেকাতে ব্যর্থ হয় তখন পুলিশ, বিডিয়ারের পাশাপাশি সরকারের গুন্ডা বাহিনী মিছিলে হামলা চালায় লাঠিচার্জ, টিয়ার সেল নিক্ষেপ এবং গুলিবর্ষণ করে। গুলিবর্ষণে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া কলেজের ছাত্রনেতা জেহাদসহ ৫ ব্যক্তি নিহত হয় এবং গ্রেফতার হয় বেশ কিছু লোক ঘটনাটি শহরে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। এ দিন ৭ দলীয় জোট নেত্রী পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। সকাল থেকে ছাত্রীরা সর্বোতভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এক পর্যায়ে ছাত্ররা জেহাদের লাশ ক্যাম্পাসে নিয়ে আসে হাজার হাজার ছাত্র তখন ক্যাম্পাসে সমবেত হয়। এ পরিস্থিতিতে সব ছাত্র সংগঠন মিলে মাত্র ৭ মিনিটের আলোচনায় 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' গঠন করে। ছাত্র সংগঠনগুলো নিজেদের সমস্ত মতপার্থক্য আপাতত স্থগিত রেখে এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক নজির সৃষ্টি করে। চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য এটি ছিল প্রথম এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জেহাদের লাশকে সামনে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ছাত্র ছাত্রীরা আপস করে এরশাদের পতন না ঘটিয়ে তারা ঘরে ফিরবে

Dhaka University Institutional Repository

না। এ সপথের দৃঢ়তায় ম্লান হয়ে যায় রাজনৈতিক ঐক্যের অসম্পূর্ণতা। ১০ অক্টোবরের পরিস্থিতির প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর দেশব্যাপী হরতাল পালন করে ৩ জোট। এতে সর্বস্তরের মানুষ সমর্থন জানায়। নেতারা আন্দোলন আরো জোরদার করার আহ্বান জানায়। 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ' জাতীয় নেতাদের প্রতিও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ১৩ অক্টোবরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের দিনও ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ কওে এতে মনির ও রতন নামে ২ জন বিক্ষোভকারী নিহত ও বহু আহত হয়, এতে বিক্ষোভের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। ছাত্রদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে না পেরে ১৩ অক্টোবর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।[১]

তথাপি একের পর এক হরতাল বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, রাজপথ-রেলপথ অবরোধ, গণবিক্ষোভ ইত্যাদি চলতে থাকে সারা দেশব্যাপী। এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষকরা ও অভিভাবকরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবিতে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন।[২]

এভাবে একের পর এক কর্মসূচি গ্রহণের পর ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করে ২৭ অক্টোবরে বিরোধী বড় দলগুলো বড় ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাজনৈতিক দল ও 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যেও' নেতাকর্মীরা রাস্তায় অবস্থান নিয়ে মিটিং মিছিল করে। ৫ দল ও ছাত্রঐক্য বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানায়।

সরকার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে নেয়ার জন্য সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারেনি বিরোধী জোটগুলোর কারণে। ৩ জোট জামায়াতসহ প্রায় সব বিরোধী জোট ও দল সাংস্কৃতিক পেশাজীবী ও ছাত্র সংগঠন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য মিছিল সমাবেশ করে। ৫, ৭ এবং ৮ দল এককভাবে শান্তি মিছিল করে।

বস্তুত : আন্দোলনের এ পর্যায়ের ছাত্রদের একের পর এক আন্দোলনমুখী কর্মসূচির পাশাপাশি রাজনৈতিক জোটগুলোকে একত্রিত হওয়ার আহ্বানে এরশাদ পতনের আন্দোলনের এক নবধারা সৃষ্টি করে।

১ লা নভেম্বর এরশাদের ঢাকা শহরে কারফিউ জারির পাশাপাশি সেনা তলবের ঘটনায় আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠে বিরোধী জোট ও ছাত্রনেতারা। ৪ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ১৪৪ ধারা

Dhaka University Institutional Repository

ভঙ্গ করে এক বিরাট মিছিল বের করে। এই অবস্থায় সরকারের পক্ষেও ১৪৪ ধারা ধরে রাখা সম্ভব ছিল না, ফলে ৪ নভেম্বর ১৪৪ ধারা সরকার তুলে নিতে বাধ্য হয়।

চলতে থাকে বিরোধী জোট, দল ও 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যর' হরতাল, সমাবেশ, মিছিল। সরকারকে সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিকনির্দেশনা ঘোষণা করে বিরোধী জোট। ১০ নভেম্বর বিরোধী দলগুলোর আহ্বানে পালিত হয় চলতি আন্দোলনের সবচেয়ে সফল হরতাল কর্মসূচি। এ দিন 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক সরকারের আদেশ লঙ্ঘন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয় এবং প্রত্যেক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দলগুলোর লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচির সাফল্যে সরকারের অস্তিত্বই ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে ক্রমশ।

১৪ নভেম্বর আদমজীতে সরকারি শ্রমিক পার্টির সংগে বিরোধী সংগঠনগুলোর সংঘর্ষে ১২ জন শ্রমিক নিহত হয়। ৩ জোটের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের বৈঠকে সব রকমের আন্দোলন সংগ্রামের করা উপর গুরুতারোপিত হয়। শ্রমিক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন আরো বেগবান করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অবিলম্বে এককেন্দ্রিক আন্দোলন শুরু করার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা প্রদানের দাবি জানায়।

১৭ নভেম্বর বিরোধী আন্দোলনের এক তাৎপর্যপূর্ণ উত্তোরণ ঘটে ছাত্র ঐক্যের মন্ত্রী পাড়া ঘেরাও কর্মসূচিতে। সরকার তার রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে ভাড়া করা লোক এবং সারা দেশের সরকার নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যক্তিবর্গকে সমাবেশে অংশ নিতে বাধ্য করা হয়। মন্ত্রী পাড়ার আশপাশে ৮টি সমাবেশ ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মুখে গুঁড়িয়ে যায়। সরকারের এ প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে বিপুল সংগঠক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে রক্ষা করা হয়। কিন্তু ছাত্র-জনতার রুদ্ররোষে সরকারি দলের ৩টি সমাবেশ মঞ্চ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অন্যান্য মঞ্চ থেকে তড়িঘড়ি সরকারি সমাবেশ সমাপ্ত করা হয়। রাজপথে আন্দোলনকারী শক্তির সুস্পষ্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি সন্ত্রাসী চক্র ও পুলিশের নিপীড়নের জবাবে ছাত্রনেতা ও বিরোধী রাজনৈতিক জোট নেতারা জানিয়ে দেন লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস আন্দোলনকে বানচাল করতে পারবে না।

১৯৯০-এর ১৯ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এ দিন স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আন্দোলনরত ৩ জোট

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিধাদন্দ্ব কাটিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ও একটি অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে।[৩] ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট চলমান আন্দোলনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা ঘটিয়ে পূর্ণ গণতন্ত্রে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করে একটি ঐতিহাসিতক যুক্ত ঘোষণা দেয়। এটি যুক্ত ঘোষণা, যৌথ ঘোষণা, অভিন্ন ঘোষণা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা তিন জোটের রূপরেখা ইত্যাদি যে নামেই ডাকা হোক না কেন ১৯৯০ সালের ১৯ নভেম্বরের প্রদত্ত আন্দোলনরত রাজনৈতিক জোট তিনটির এই যৌথ ঘোষণাই ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ এই ৯ বছরে রাজনৈতিক শিবিরের বিভিন্ন আদেশের মধ্যে জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে সেটার পতন ঘটানোর ব্যাপারে তাদের দিক থেকে সবচেয়ে পরিকল্পিত, অগ্রসর ও সাহসী কর্মসূচি ও পদক্ষেপ। ৩ জোটের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী, ৭ দলীয় সংগ্রামী জোট, জনতাদল সহ আন্দোলনরত অপরাপর দল সমূহ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা (প্রগুক্ত) ঘোষণা করে। এর ফলে বিরোধী দলগুলো তাদের লক্ষ্যকে ঐক্যবদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭০ জন শিক্ষক বিরোধী জোট ও দলগুলোর সাথে যোগদান করার জন্য এ দিন ১৯ নভেম্বরে এক মুক্ত বিবৃতিতে ২ নেত্রীকে এক মঞ্চে আসার আহ্বান জানান। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী ৩ জোটের রূপরেখা ঘোষণা আন্দোনের গুণগত উত্তরণে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, পেশাজীবী, সংস্কৃতিক ফোরামসহ জনতার তীব্র শাণিত আন্দোলনের আঘাত কেন্দ্রীভূত হয় একটি লক্ষ্যে তা হল স্বৈরাচারের পতন।

এরশাদ সরকার এবং তার দোসরদের শক্তি প্রয়োগ ও বিভ্রান্ত সৃষ্টির অপচেষ্টা সত্ত্বেও জন্য নভেম্বরের কর্মসূচির অভিন্ন ঘোষণা সারা দেশের বিশেষ করে শহর কেন্দ্রীক চাকরিজীবি, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীদের মধ্যে অভূতপূর্ব সারা জাগায়। অত্যন্ত উৎসাহ আগ্রহ আবেগের সঙ্গে নবপ্রেরণায় উদ্ভাসিত হয়ে, আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনায় আস্থাশীল হয়ে জনগণ আন্দোলনরত বিরোধী রাজনৈতিক জোটসমূহের পেছনে এবং সাধারণভাবে মবিলাইজড বা সমাবেশকৃত হয়। শুধু সমাবেশের ব্যাপারেই নয়, জনগণ অতি দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠে, প্রতিটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ তীব্র থেকে তীব্রতর মাত্রায় জঙ্গি হয়ে ওঠে। বরাবরের মতো অনেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে অপচেষ্টা চালিয়েও প্রতিরোধের সব প্রচেষ্টা চালিয়েও এরশাদ ও তার সরকার ১৯ নভেম্বরের ১৯৯০-এর যৌথ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে নবসৃষ্ট বেগবান আন্দোলন সংগ্রামকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী জোট দল ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের জোরদার ও লাগাতার বিক্ষোভ সারা দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরের অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছে ২৭ নভেম্বর ১৯৯০। এ দিন সকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল উত্তপ্ত। ছাত্র মিছিলে একের পর এক হামলা চালায় সরকারের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীরা। অনেক নেতাকর্মী আহত হয়, এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশানের যুগ্ম সম্পাদক ডা: শামসুল আলম মিলন নিহত হলে এই খবর শুনে সব শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পেশাজীবীদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ডা: মিলনের মৃত্যু স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং এই আন্দোলন প্রবল গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

তীব্র গণআন্দোলনের মুখে রাতে এরশাদ সরকার সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং বিকেলে সংবাদ প্রেরণের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এমনকি ডাক, তার ফ্যাক্স-ফোন ইত্যাদি ব্যবহারের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সারা দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করতে থাকে।

২৮ নভেম্বর ১৯৯০ ছিল জনতার কর্তৃক ক্ষমতার শেষ কাঁটাটি উপরে ফেলার দিন। এ দিন সকাল থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, সংস্কৃতিকর্মীরা এরশাদের জরুরি অবস্থার যাবতীয় ঘোষণা উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল করার জন্য বিক্ষোভকারীরা সমবেত হতে শুরু করে। এরশাদের পতন না হওয়া অবধি সাংবাদিকদের সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ রাখার ঘোষণার পাশাপাশি ২৯ নভেম্বর শিক্ষকদের মিছিলে হামলা ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যসহ সমস্ত শিক্ষক পদত্যাগ করে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিল ও কর্মসূচির পাশাপাশি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে রাজনৈতিক জোট ও দলের আন্দোলন। সাংবাদিকদের ধর্মঘটের পাশাপাশি রেডিও-টিভির শিল্পীরা ও অনুষ্ঠান বর্জন করায় স্বাভাবিক অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে। পুনরায় সান্ধ্য আইন জারি সত্ত্বেও বিক্ষোভ মিছিল চলতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে ছাত্র-জনতার সঙ্গে সরকারি বাহিনীর সংঘর্ষে বহু লোক হতাহত হয়। এদিন ২৯ নভেম্বর থেকে ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে মিছিল, গণজামায়েত ইত্যাদি এবং পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর লাঠিচার্জ টিয়ার গ্যাস গুলি উপেক্ষা করে রাত গভীর পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লা ও প্রায় প্রতিটি রাস্তায় মিছিল চলতে থাকে। এরশাদ সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

পদত্যাগের দাবিতে সব রাজনৈতিক ঐক্যজোট ও দলের যৌথ আহ্বান ও নির্দেশনা মতো আন্দোলন আরো বেগবান হয় ও সব কর্মসূচি চালিত হতে থাকে। ১ ডিসেম্বর ১৯৯০ হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের হলে এ দিন ঢাকা মহানগরে জনতা ও বিডিআরের সঙ্গে সবচেয়ে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয় মিরপুরে।[৪]

সেদিন প্রায় ১৫ জন নিহত হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিডিআর বাড়িতে হানা দিয়ে নিরীহ জনসাধারণ ও নির্যাতন চালায়। এ পরিস্থিতিতে এরশাদ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. এম এ মতিন ও অপর ৩ মন্ত্রীসহ ১৯ জন সংসদ সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন।[৫]

২ ডিসেম্বর ১৯৯০ গণবিক্ষোভের বিস্তার ও তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। রামপুরা এলাকায় ও মালিবাগ রেল ক্রসিংয়ের কাছে জনতা কয়েক দফা পুলিশ ও বিডিআরের লরির ওপর হামলা চালায়। এ দিন প্রেসক্লাবের সামনে জনতার সমুদ্র আরো বিশাল আকার ধারণ করে। আইনজীবীরা ও আদালত বর্জন করে। ছাত্ররা গণআদালতে এরশাদের বিচার করে কুশপুত্তলিকা গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয় এবং দাহ করে। ড. কামাল হোসেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আরোপিত আইনজীবীদের এক সমাবেশে এরশাদ সরকারকে অবৈধ ও খুনি ঘোষণা করেন। আইনজীবীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আদালত বর্জনের ঘোষণা দেন।[৬]

সারা ঢাকা শহরে গণঅভ্যুত্থান বুলেটিন, কামাল হাসানের আঁকিত বিশ্ব বেহারা স্কেচসহ কবিতা ও প্রচারপত্র ছাড়া হয়। ৮, ৭, ও ৫ দলীয় জোট সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন, হরতাল অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। যা সবাইকে আন্দোলনে আরো বেশি সম্পৃক্ত করে। সরকারি অফিসাররা ৩ ডিসেম্বর আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং বিসিএস কর্মকর্তারা পদত্যাগ করে মিছিলে অংশ নেন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি একবারে ভেঙে পড়ে। ঢাকায় গণঅভ্যুত্থান বুলেটিন ২ প্রকাশ করা হয়।

দেশের এ বিস্ফোরণ পরিস্থিতিতে জেনারেল এরশাদ ৩ ডিসেম্বর রাতে বেতার-টিভিতে এক ভাষণে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে সমঝোতামূলক প্রস্তাব দিয়ে বলেন যে, নির্বাচনের ১৫ দিন আগে তিনি পদত্যাগ করবেন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক নেতারা ও ছাত্র-জনতা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এরশাদের পদত্যাগের এক দফা দাবি নিয়ে রাজপথে নেমে আসে।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

৪ ডিসেম্বর সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এরশাদের পতন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। লাখো মানুষের ঢল নামে। অফিস আদালত শূন্য হয়ে পড়ে। এক দফা এক দাবি এরশাদ তুই কখন যাবি। স্লোগানে ছাত্র-জনতা রাজপথে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, দুপুরের পর মিছিলগুলো সমাবেত হয় প্রেসক্লাবের সড়কের সামনে। সব শ্রেণীর লোক এরশাদের পতনের আন্দোলনে সমবেত হয়ে জন সমুদ্রের সৃষ্টি করে সেখানে তিল ধারনের ঠাঁই হয় না। তখন পুলিশ ছাত্রনেতাদের ভাষণ শোনেন। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া তাদের ভাষণে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মহান শহীদদের আত্মত্যাগ ও সব মানুষের সমর্থনে গণঅভ্যুত্থানের সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। তারা এরশাদের পতন না হওয়া পর্যন্ত সব শ্রেণীর মানুষের প্রতি এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। বিরোধী রাজনৈতিক জোট দলসমূহের ৯ বছরের আন্দোলনের ফসল হিসাবে ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার রাজপথে লাখ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে নির্ধারিত হয় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি। জনসমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যায় 'স্বৈরাচারের বলদর্পী দুঃশাসন' ভেসে আসে জে. এরশাদ ৪ ডিসেম্বর ৯০ রাতেই পদত্যাগের ঘোষণা দেন। রাত ১০টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইংরেজি সংবাদে জানিয়ে দেয়া হয় এরশাদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিরোধী দলগুলোর নিকট নিরপেক্ষ উপরাষ্ট্রপতির নাম আহ্বান করা হচ্ছে। বিজয়ের মহাকাব্য এ ঘোষনার পর মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়। রাস্তায় নেমে আসে মানুষের ঢল, নিমিষেই রূপান্তরিত হয় আনন্দ উল্লাসমুখর বিজয় মিছিলে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বে গণবিজয়ে উদ্ভাসিত হয় সারা বাংলাদেশ। ৫ ডিসেম্বর ৩ দলীয় ঐক্যজোট ও জামায়াতে ইসলামী সর্বসম্মতিক্রমে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে উপ রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেন। জাতীয় সংসদ বাতিল ঘোষণা করেন।[৮]

১৯৯০ এর ৫ ডিসেম্বর সকালে ৮ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট নেতৃদ্বয় শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত টেলিভিশন ভাষণে জনগণকে ধৈর্য ধরতে ও সংযমশীল হতে অনুরোধ জানায়।

সারা দেশে শুরু হয় বিজয় উৎসব। রাজধানী ঢাকা আক্ষরিক অর্থেই পরিণত হয় উৎসবের নগরীতে। উৎফুল্ল ছাত্র-জনতা রাজধানীর অলিগলি পাড়া মহল্লা থেকে বিজয় মিছিল নিয়ে আসতে থাকে শহরের কেন্দ্রগুলোর দিকে। জাতির প্রেসক্লাব থেকে শুরু করে পল্টন মোড়, নুর হোসেন চত্বর, বায়তুল মোকাররম ও গুলিস্তান চত্বর ছিল ছাত্র-জনতার মহামিলন কেন্দ্র।

Dhaka University Institutional Repository

বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত জনতা। সকাল ১০টা থেকে পল্টন মোড়ে নির্মিত 'জনতার জয়' সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে সারাদিন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং ছাত্রনেতাসহ পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা মঞ্চ থেকে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্রপক্ষ থেকে ডাকসু জি.এস খায়রুল কবির খোকন একটি ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। ঘোষণা পত্রে অবৈধ ক্ষমতা দখল ও দুর্নীতির অভিযোগে অবিলম্বে এরশাদকে গ্রেফতার এবং বিচারসহ নিম্নোক্ত ঘোষণাগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়নের আহবান জানানো হয়।

ঘোষিত দাবিসমূহ হলো :

১. আজ থেকে সব বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়।

২. গত ৯ বছরের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নিহতদের জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদান এবং ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে শহীদ পরিবার বর্গকে ক্ষতিপূরণ দানের ঘোষণা।

৩. আগামী ২৪ ঘন্টায় মধ্যে সব ছাত্র যুবকবন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি, দন্ডাদেশ বাতিল ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার।

৪. দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী এমপিদের অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, এরশাদ সরকারের সব মন্ত্রীকে গণ দুশমন ঘোষণা ও তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধকরণ।

৫. এরশাদের নামে নামাঙ্কিত সব প্রতিষ্ঠানের নাম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার।

৬. মতিঝিল আলাওয়ালা ভবন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতির যাদুঘর ঘোষণা।[৯]

৩ জোটের লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে সন্ধ্যে সাতটায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান বিচার পতি শাহাবুদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে মনোনীত হন। প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে শর্ত সাপেক্ষে তিন জোটের অনুরোধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে দেশের দায়িত্বভার নিতে সম্মত হন।

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তিন জোটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ দিন সকালে এরশাদ তাঁর মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন এবং নির্বাচন কমিশনার ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন। বিমর্ষ বিধ্বস্ত স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপতি এরশাদ রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসেন এবং তার অব্যবহতি পরে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের সংগে আধাঘণ্টা কথা বলেন। এরপর উপরাষ্ট্রপতি ব্যরিস্টার মওদুদ আহমদ রাষ্ট্রপতি এরশাদের কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। দুপুর ২.৪০টায় ১৫ মিনিটের এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এরশাদ তাঁর পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।[১০] এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যরিস্টার মওদুদ আহমদ, কেবিনেট সচিব এম কে আনোয়ার, রাষ্ট্রপতির মুখ্য সচিব এ এম এইচ সাদিক, নেবাহিনীর প্রধান লে. জে. নূরউদ্দিন খান, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল মমতাউদ্দিন আহমদ ও নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল আমীর আলী মুস্তফা। পদত্যাগ করার পর পরই এরশাদ ও ব্যরিস্টার মওদুদ আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন জানান। বাহিনীর প্রধানগন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে অভিননন্দ জানান। এর পর তিনি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং ৩ নেতার মাজারে সুরা ফাতেহা পাঠ করেন।

পদত্যাগকারী স্বৈরশাসক এরশাদ শেষ বারের মতো পরাজিত বিতাড়িত ও ধিকৃত ব্যক্তি হিসেবে বিষণ্নবদনে মসনদ ছেড়ে রাষ্ট্রপতি সচিবালয় ত্যাগ করেন। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষসহ বিশ্বের উৎসুক মানুষ এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের এ দৃশ্য বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদ বুলেটিনে উপভোগ করেন। আর এভাবেই সমাপ্ত হলো ব্যক্তি কেন্দ্রীক দুঃশাসনের দীর্ঘ ৯ বছরের শাসন।[১১] জনতার শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে বিদায় নিলেন ইতিহাসের স্বৈরশাসক জগদল একটি পাথর নেমে গেল বাংলাদেশের বুকের উপর থেকে।

এভাবে এরশাদের স্বৈরাশাসনের অবসান হয় জয় হয় রাজনীতির, দেশের রাজনৈতিক শক্তির, সর্বোপরি গণতন্ত্রের, স্বৈরশাসনে বিধ্বস্ত ছাত্রদের ভাবমূর্তী উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়। সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের গ্রহণযোগ্যতা। গণতন্ত্রের হয় শুভসূচনা।

পাদটীকা :

১. সাপ্তাহিক ছুটি, বর্ষ-৮, সংখ্যা-৪০, ১৯ অক্টোবর, ঢাকা, ১৯৯০ ইং ১১

২. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পা) গণ-আন্দোলন ১৯৮২-৯০, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১৬৮।

৩. দৈনিক সংগ্রাম, ২০ নভেম্বর ঢাকা, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

৪. রুহুল আমিন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারার নেতৃত্ব, হীরা বুক মার্ট, ঢাকা ১৯১৩, পৃ: ৫৭৬

৫. এম.ওয়াজেদ মিয়া, প্রা---- পৃ: ৩৫৪

৬. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদক), প্রাগুক্ত পৃ: ১৮১

৭. এম জাভেদ মিয়া, প্রাগুক্ত, ৩৫৫

৮. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদক), প্রাগুপ্ত পৃ: ১৩২-১৩৩

৯. মেজর রফিকুল ইসলাম, পিএসসি, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৪-১৭৫

১০. আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, ৭০ থেকে ৯০ (বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট), পান্ডুলিপি ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ: ১৯৭, M, Nazrul Islam, æParliamentary Democracy in Bangladesh an Assessment, Prespectives in Socail Science, Vol. S. University of Dhaka. October 1998 pp.59

১১. Talukder Maniruzzamn, Politics and Security of Bangladesh, University Press, Ltd., Dhaka, 1994, P-143.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সাক্ষাৎকার পর্যালোচনা ও ফলাফল

আলোচ্য গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলি পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে রাজনৈতিক নেতাদের মতামত জরীপ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাৎকারের নির্দেশিকা এবং সর্বোপরি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা : (Questionnaire)

বর্ণনামূলক গবেষণার সর্বাধিক ব্যবহৃত উপকরণ হলো এ গবেষণা উপকরণ। আলোচ্য গবেষণায় মোট ১৯ টি প্রশ্নমালা উথাপন করা হয়েছে। মতামত দানকারীদের ৩টি ভাগে ভাগ করে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক. রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাৎকার :

সরকার ও বিরোধী দলে রাজনৈতিক নেতারা যেহেতু সব সময় সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। তাই গবেষণাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা ও উপস্থাপন করার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টিতে এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাছাইকৃত ৫০ জন রাজনৈতিক নেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ. শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবদের সাক্ষাৎকার :

গবেষণার বিষয়টি রাজনৈতিক তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অর্থাৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব গবেষণার সঠিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য এ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার :

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা অনেক বড় অবদান রেখেছে যুগে যুগে। তাই আলোচ্য গবেষণার প্রয়োজনে ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে তাদের মতামতের পর্যালোচনায় গবেষণাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

৫.১. উত্তরদাতাদের মতামত :

এরশাদের শাসনামল ও বিরোধী দলের ভূমিকা বিশেষণে রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষার্থী মিলিয়ে ২০০ ব্যক্তির মতামত জরিপ করা হয়। মতামত জরিপে বিশেষ ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়। উত্তরদাতা নির্বাচনে যথাসম্ভব লিঙ্গসমতা বজায় রাখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩৫% ছিল মহিলা আর বাকি ৬৫% ছিল পুরুষ।

রেখাচিত্র : ৫.১

মোট টার্গেট গ্রুপের স্তর

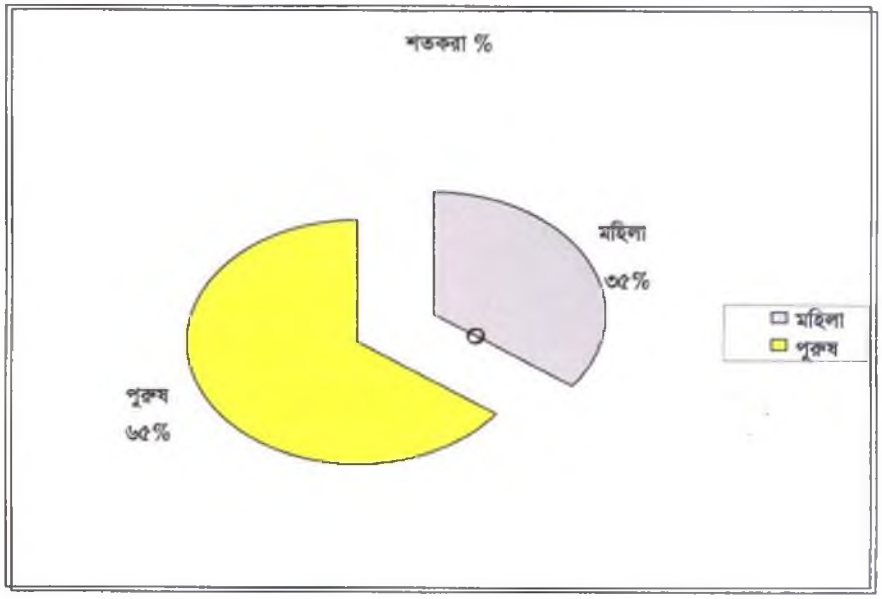

Dhaka University Institutional Repository

৫.২. উত্তরদাতাদের বয়সসীমা :

উত্তরদাতাদের বয়স ছিল (২০-৭৫) বছর পর্যন্ত। টেবিল ৫.১ অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক ৫০% উত্তরদাতা ছিলেন ৪১-৬৫ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে। এরপরই ছিল ২০-৩০।

পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এবং বয়সসীমা শ্রেণী বিন্যাসের বৈজ্ঞানিক রীতির আলোকে টেবিল নং ৫.১ অনুসারে সর্বমোট ৫টি বয়স শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অপরদিকে সবচেয়ে কম সংখ্যা (১০%) উত্তরদাতা ছিলেন ৭০ বা তদূর্ধ্ব বয়স শ্রেণীর

টেবিল : ৫.১

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা :

বয়সসীমা	উত্তরদাতা (%)
২০-৩০	২০%
৩১-৪০	১৫%
৪১-৬৫	৫০%
৬৬-৭০	৫%
৭১ +	১০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্রঃ ৫.২

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

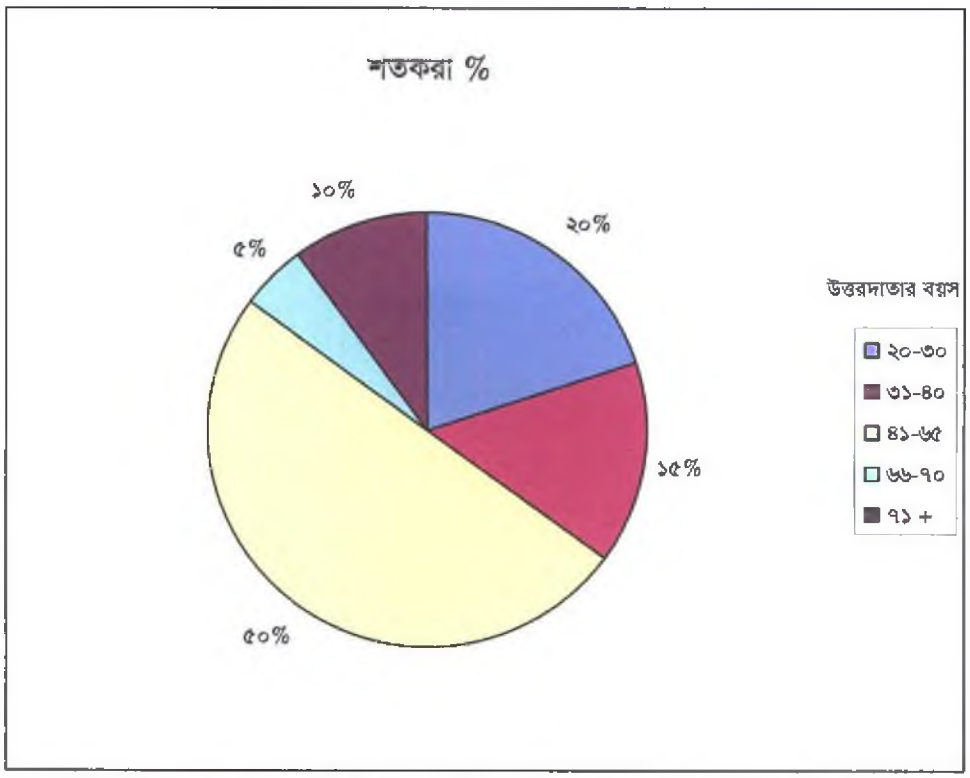

৬৬-৭০ বছর বয়স গ্রুপ থেকে সর্বনিম্নসংখ্যক ৫% উত্তরদাতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৫.৩. উত্তরদাতা বা মতামত দানকারীদের পেশা :

অলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে এবং সঠিক তথ্য ত্রিভূজীকরণ (Triangulation) করার সুবিধার্থে বিভিন্ন পেশা শ্রেণীর লোকজন থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। টেবিল ৫.২ অনুযায়ী পেশাভিত্তিক প্রদত্ত সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা ছিল রাজনৈতিক নেতারা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী। অপরদিকে, পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকবৃন্দের ও বুদ্ধিজীবীদের অগ্রাধিকার ছিল অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক এবং এটা সারাদেশে স্বীকৃত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা ও বুদ্ধিজীবীরা নিজ নিজ পেশাগত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জ্ঞানের অধিকারী। তাই তাদের থেকে সংগৃহীত মতামত গবেষণার লক্ষ্য পৌঁছতে অত্যন্ত দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছে এবং গবেষণা সমস্যার অন্তর্নিহিত সমাধান যথাযথভাবে তাদের সাক্ষাতকারে প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৫.৩

পেশা অনুযায়ী : মতামত দানকারীদের পেশা :

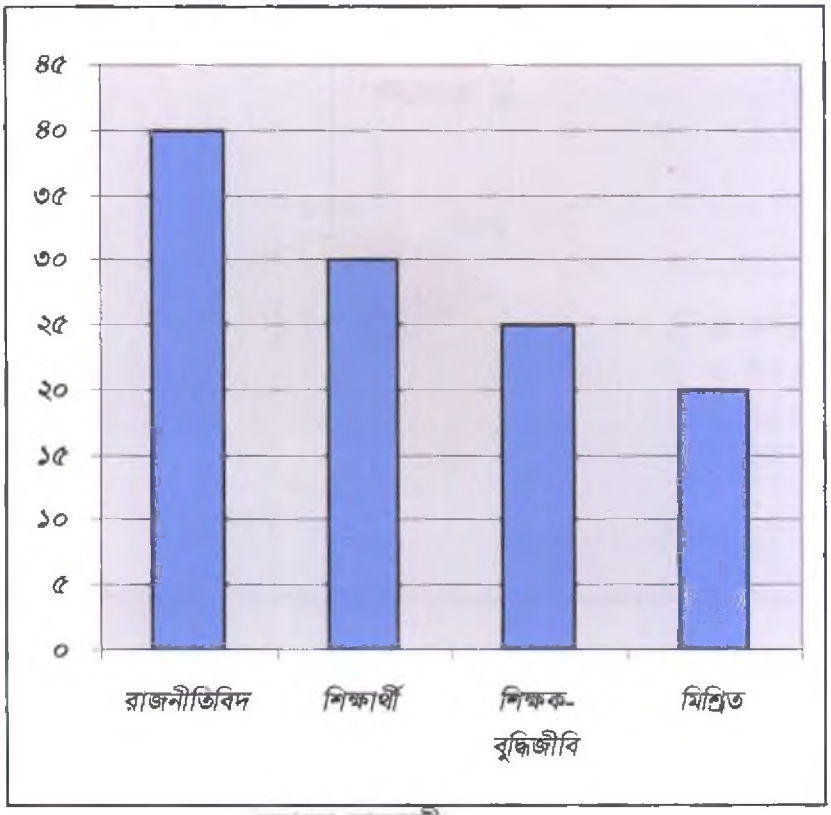

৫.৪. উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা :

বিভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যক্তিবর্গ উত্তরদাতাদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে ৪টি স্তরে বিভক্ত করে পরিসংখ্যানিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

টেবিল ৫.৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

স্তর	সংখ্যা	শতকরা
এসএসসি	৩	২%
উচ্চ মাধ্যমিক	৩০	১৫%
উচ্চ শিক্ষা	১৬৭	৮৩%
মোট	২০০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৫.৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

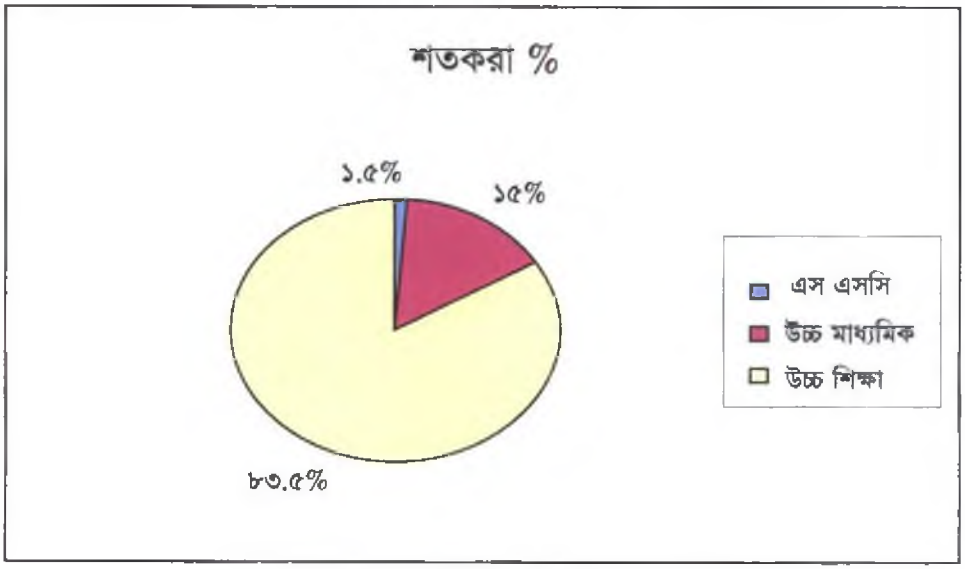

৫.৫. মতামত প্রদানকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থান :

রেখাচিত্র ৫.৬ মতামত প্রদানকারীর অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

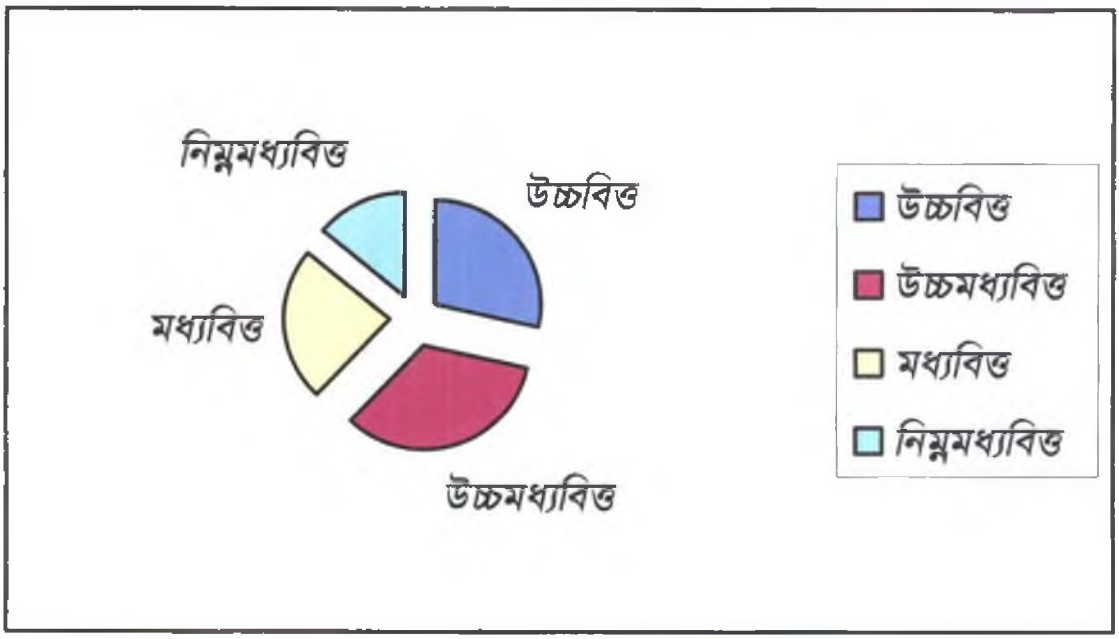

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র ৫.৬ অনুযায়ী সর্বাধিকসংখ্যক মতামত দানকারী ছিলেন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি। অপরদিকে অন্যান্য শ্রেণীর মতামত প্রদানের হার ছিল দ্বিতীয় স্থানে উচ্চবিত্তের অবস্থান। তারপর মধ্যবিত্ত এবং চতুর্থ অবস্থান নিম্নমধ্যবিত্ত।

৫.৬. মতামত প্রদানকারীদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা :

মতামত জরিপের জন্য রাজনীতিবিদ, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষার্থী দের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের পক্ষপাতহীনতা যাচাইয়ের জন্য মতামত জরিপে তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিষয়ক তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। এক্ষেত্রে শতকরা ৮০% উত্তরদাতার সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল। কিন্তু ২০% উত্তরদাতা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বীয় রাজনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকেই মতামত দিয়েছেন।

প্রদানকৃত মতামত বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণ :

৫.৭. সামরিক শাসন সমর্থন করেন কি না?

মতামত প্রদানকারী প্রায় সকলেই (৯৯%) ওই প্রশ্নের জবাবে সামরিক শাসন সমর্থন করেন না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রায় প্রত্যেকের মতামতগুলোই সমর্থক ছিল। যেমন :

- সামরিক শাসন গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে।
- একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।
- স্বৈরশাসনের জন্ম দেয়।
- সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সামরিকীকরণ করা হয়।
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী হয় না।
- দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে।
- সেনাবাহিনীকে ক্ষমতালোভী করে তোলে।
- উৎপাদনশীল খাতগুলো ধ্বংসের মুখোমুখি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮. সামরিক শাসন সম্পর্কে মতামত দানকারীদের অভিমত :

মতামত দানকারী ৯৮% ব্যক্তিই সামরিক শাসন সম্পর্কে নেতিবাচক মতামত দিয়েছেন। যেমন : সামরিক শাসন গণতান্ত্রকে বিপন্ন করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বৈরশাসন কায়েম করে। সামরিকীকরণের বেড়াজালে মুড়িয়ে ফেলে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এতে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল হয়ে যায়। দুর্নীতিতে ছেঁয়ে যায় সমস্ত প্রতিষ্ঠান। সেনাবাহিনীকে ক্ষমতার প্রতি লোভী করে তোলে। দেশের উৎপাদনশীলন খাতগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে। জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব হয় যা দেশ ও জনগণের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনে। প্রশাসনিক সামরিকীকরণের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণে তৎপর হয়। সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট হয়।

প্রায় সবাই সামরিক শাসনের বিপক্ষে মত দিয়েছেন।

নিরপেক্ষ থেকেছেন মাত্র ২%। যারা এ সম্পর্কে কোনো মত দেননি।

রেখাচিত্র ৫.৭

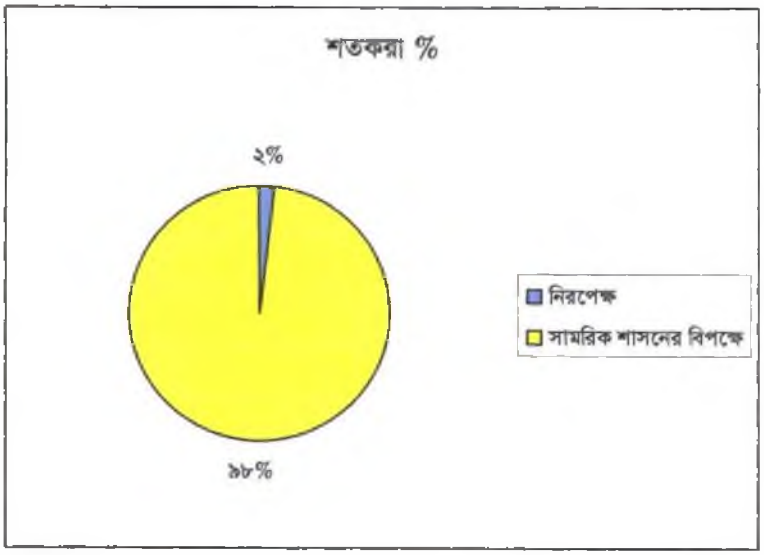

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯. এরশাদের সামরিক শাসন সম্পর্কে মতামত :

মতামত প্রদানকারীদের প্রায় সকলেই ৯৭% এরশাদের সামরিক শাসনকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে কলঙ্কিত ও ক্ষতিকর বলে মতামত দিয়েছেন। মাত্র ৩% মতামত প্রদানে অসম্মতি জানিয়েছেন। এরশাদের সামরিক শাসন সম্পর্কে মতামত দানকারীদের অভিমত ঃ

- এরশাদের সামরিক শাসন বাংলাদেশের সামরিক শাসন গণতান্ত্রিক চর্চাকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে।
- একনায়কতান্ত্রিক দুঃশাসনের জন্ম দিয়েছে।
- এরশাদের সামরিক শাসন বাংলাদেশের জন্য দুভার্গ্যজনক ছিল।
- দুর্নীতি দেশের প্রায় সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিল।
- বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে।
- শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে।
- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সামরিকীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।

৫.১০. এরশাদ শাসানামলে বিরোধী দলের ভূমিকা মূল্যায়ন :

এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গিয়ে মতামত দানকারীদের বেশিরভাগই বিরোধী দলের কিছুটা দুর্বলতা স্বীকার করা সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলোর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন এবং এরশাদের পতনের ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর পাশাপাশি বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

কোনো কোনো রাজনৈতিকবোদ্ধা অবশ্য বিরোধী দলের ভূমিকার প্রশংসার পাশাপাশি মন্তব্য করেছেন জে. এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণের শুরু থেকে বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা যতটা কঠোর হওয়া প্রয়োজন ছিল ততটা কঠোর ভূমিকা রাজনৈতিক দলগুলো পালন করতে পারেনি। তথাপি এরশাদ শাসনামলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দলীয় কিছু কোন্দল এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থার অভাব ও রেষারেষি থাকা সত্ত্বেও এরশাদকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করে বিরোধী দলগুলোর লাগাতার আন্দোলন, বিক্ষোভ ও সর্বোপরি জোটবদ্ধ হয়ে এরশাদ হটানোর আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বিরোধী দল ও জোটগুলো। সর্বোপরি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটের লাগাতার

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের ফলেই শেষ পর্যন্ত আপামর জনতার সমর্থন নিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

৫.১১. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে মতামত দানকারীগণ বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

- সামরিক বাহিনী ব্যারাকে থেকে দেশ ও সীমান্তরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকবে।
- রাষ্ট্রপতি দেশের স্বার্থে সামরিক বাহিনীকে কোনো দায়িত্ব প্রদান করলে তা পালন করতে বাধ্য থাকবে।
- দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকারকে সহায়তা করবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দেশ ও জাতির পাশে থেকে কাজ করবে।
- রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

৫.১২. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এ প্রশ্নের জবাবে মতামত প্রদানকারীদের মতামত ঃ

- সততা
- দেশপ্রেম
- দায়বদ্ধতা
- জবাবদিহিতা
- দেশের উন্নয়ন সাধন
- খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের সর্বাগ্রে উন্নয়ন
- নমনীয়তা ও সহনশীলতার মনোভাব
- সংসদকে কার্যকর করা

Dhaka University Institutional Repository

৫.১৩. এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে রাজনীতিবিদগণ তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। রাজনীতিবিদদের অনেকে এরশাদ শাসনামলে জেল খেটেছেন ও নানাবিধ নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন যা তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাক্ষ্য বহন করে। তখনকার বিভিন্ন শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীগণ তাদের নিজস্ব মতামত প্রদান করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তথাপি উল্লেখ্য, কিছু কিছু রাজনীতিবিদ স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরশাদের দলে ও কর্মে যোগ দিয়ে রাজনীতিবিদদের ভাবমূর্তি হেয় করেছেন।

৫.১৪. এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এত দীর্ঘ হওয়ার পেছনে উত্তরদাতাদের মতামত হলো :

- রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাব।
- পারস্পরিক বিরোধ ও রেষারেষি।
- রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল।
- এরশাদের কূটচাল।
- এরশাদ সুকৌশলে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ও দুর্নীতি ছড়িয়ে দিয়েছিল।
- কিছু রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা।
- আওয়ামী লীগের ১৯৮৬ নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

৫.১৫. এরশাদ সরকারের সবচেয়ে দুর্বলতার দিক সম্পর্কে মতামত দানকারীদের অভিমত হল ঃ

- জনসমর্থনের অভাব
- এদেশের জনগণ কখনই একনায়কতন্ত্র পছন্দ করেন না।
- দুর্নীতির ব্যাপকতা।
- শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস।
- শাসন ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রশাসনিক ব্যবস্থার সামরিকীকরণ
- গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ধ্বংস সাধন।
- প্রহশনমূলক নির্বাচন।
- জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোর ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব।
- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ধ্বংস সাধন।
- আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি।
- ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার।

৫.১৬. ৩ জোটের রূপরেখা সম্বন্ধে উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই। প্রায় সব মতামত দানকারীরা একমত পোষণ করেছেন যে, এরশাদের পতনের ক্ষেত্রে ওই সময়ে ৩ জোট কর্তৃক একাত্ম হয়ে রূপরেখা প্রদান ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। ৩ জোট কর্তৃক ঘোষিত এ রূপরেখা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে আরো বেশি গতিময় করে তোলে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আপামর জনসাধারণের আস্থা দৃঢ় হয়। এ রূপরেখার ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর একক সিদ্ধান্তের প্রতি দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ একাত্ম হয়ে এরশাদ হটানোর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সর্বোপরি এরশাদের পতন হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর এ রূপরেখা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসিত পদক্ষেপ বলে সকলে মত ব্যক্ত করেছেন।

৫.১৭. ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটের নির্বাচনে যাওয়া সম্বন্ধে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ৬৫% উত্তরদাতা এ সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব হিসেবে মন্তব্য করেছেন।

২৫% দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন দিয়ে বলেছেন, তখনকার প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসেবে এ সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল ।

১০% এ সিদ্ধান্তকে ভুল সিদ্ধান্ত হিসেবে সরাসরি মত দিয়েছেন।

অনেকের মতে, এ সিদ্ধান্তটি এরশাদের ক্ষমতাকে বৈধতাদানে ও ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে দেশে দেশে আকাশচুম্বী ক্ষমতার মোহে স্বীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য বার বার স্বৈরশাসকের আবির্ভাব ঘটেছে। এসব একনায়করা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিরীহ নিরস্ত্র জনতার ওপর চালিয়েছে নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতনের স্টিম রোলার। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত ও দীর্ঘায়িত করার জন্য এহেন অপকর্ম নেই যা তারা করেননি। আপাত : সাফল্য লাভ করলেও এ স্বৈরশাসকদের কারোরই শেষ রক্ষ হয়নি। যা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। পৃথিবীর দেশে দেশে এক নায়কতন্ত্রের শেষ পরিণতি যা হয় বাংলাদেশের রাজনীতিতেও তাই ঘটলো ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এরশাদ সরকারের শাসনামলে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন অর্থাৎ তৎকালে বাংলাদেশে বিরোধীদলীয় রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বস্তুত এরশাদের দীর্ঘ নয় বছরের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর একক এবং জোটবদ্ধ সংগ্রামের ফলেই গণতন্ত্র উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এরশাদ সরকারের স্বৈরশাসন নানাবিধ কারণে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে আলোচিত অধ্যায়। নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে এই স্বৈরশাসকের উত্থান হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এ সামরিক শাসন অভিশাপ হয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিকে কলুষিত করে। মূলত : সামরিক শাসন কখনই শুভ ফল আনয়নে সক্ষম হয় না। সামরিক শাসন তাই বার বার বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বিকৃত করেছে। বিধ্বস্ত করেছে দলীয় ব্যবস্থা ও দলীয় সংহতি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কার্যকর সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকাকালীন কর্তৃত্ববাদী এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিল নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা এবং একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা।

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরেই সামরিক বাহিনীর তদানীন্তন প্রধান এরশাদ বাংলাদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্ব চালু করেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সে তত্ত্ব মেনে না নিলেও তিনি সেই তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার জন্য নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে সেই ক্ষমতাকে রাজনৈতিক বৈধতা দেয়ার জন্য জাতীয় পার্টি

Dhaka University Institutional Repository

নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৮৬ সালে তিনি নিজেকে সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। কিন্তু এ নির্বাচনগুলো ছিল এক প্রকার প্রহসন। রাষ্ট্রপতির গদি আঁকড়ে থাকলেও এরশাদের শাসনের পিছনে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি ছিল না, ছিল না কোনো প্রকার বৈধতা, সাধারণ মানুষের কাছে তিনি বরাবরই ছিলেন ঘৃণিত এক ক্ষমতা জবরদখলকারী।

এরশাদের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর ওই বছরের শেষার্ধেই বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও যোগাযোগ শুরুহয়। আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে বাংলাদেশের জনগণের। বিরোধী জোট ও দলগুলো নেতৃত্ব দিয়ে সামরিক শাসনের পতন ঘটিয়েছে।

এ ইতিহাস রচনায় শরিক হন এদেশের ছাত্রজনতা। এরশাদ রিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হতে দেখা যায় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্ররা এরশাদ বিরোধী আন্দলোনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষানীতি কেন্দ্রীক আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধার আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। ১৯৮৩ সালেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার নিমিত্তে রাজনৈতিক দলগুলো ২টি বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠন করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ১৫ দলের সমন্বয়ে একটি জোট ও বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলের সমন্বয়ে আর একটি জোট গঠিত হয়। এ জোটদ্বয়ের সঙ্গে আরো কিছু রাজনৈতিক দল এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। বিরোধী জোট ও দলগুলোর আন্দোলনের চাপে এরশাদ সরকার ১ এপ্রিল ১৯৮৩ থেকে ঘরোয়া এবং নভেম্বর মাস থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক অধিকার প্রদানে বাধ্য হয়। বিরোধী জোটের আন্দোলনের চাপে সরকার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। বিরোধী দলগুলো সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ, অবরোধ ও হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করতে থাকে। স্বৈরশাসকের নানাবিধ অত্যাচার, নির্যাতন, জেল-জুলুম ও হত্যাযজ্ঞ সত্ত্বেও এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দমিয়ে রাখতে পারেনি।

যদিও এরশাদের চতুরতা ও বিরোধী দলগুলোর দূরদর্শিতার অভাব এবং পারস্পরিক অবিশ্বস্ততার কারণে এরশাদ দীর্ঘ ৯ বছর ক্ষমতার টিকে থাকতে সমর্থ হয়। তথাপি বিশ্বের অন্যান্য স্বৈরাচারী একনায়কদের মতো করুণ পরিণতি এরশাদের ক্ষেত্রে ও আমার ঘটতে দেখেছি। এরশাদের এ পতনের পেছনে মূল ভূমিকায় ছিলেন বিরোধী রাজনৈতিক জোট ও দলগুলো। বিরোধী জোট ও দলগুলোর পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনের চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে ১৯৯০ সালের বিরোধী তিন জোটের ঐতিহাসিক রূপরেখা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতির বিজয় সূচিত হয়েছে। ওই গণআন্দোলনের

Dhaka University Institutional Repository

রূপরেখা অনুযায়ী বিরোধী দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল বলেই দেশের ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, আমলা তথা আপামর জনসাধারনের সমর্থনে সফলকাম হয়।

৩ জোটের রূপরেখা অনুযায়ী ১৯৯০ সালের ৫ ডিসেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ উপরাষ্ট্রপতি নিমুক্ত হন। জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অবসান ঘটে এরশাদ সরকারেরর নয় বছরের স্বৈরশাসনের। বিজয় সূচিত হয় সংগ্রামী বিরোধী জোট ও জনতার।

জনতার দুর্বার সংগ্রামেরমুখে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে স্বৈরাচারী এরশাদ। দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে যেমন এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমেছে। গুলিবর্ষণেরমুখে কারফিউ ও জরুরি আইনভঙ্গ করেছে। স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে। সংগ্রামী জনতা প্রমাণ করেছে ক্ষমতার সব উৎস জনগণ অস্ত্র নয়। শত শহীদের রক্তস্নাত অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিজয় হয়েছে। ১৯৯০-এ ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ সামরিক শাসনের শিকল ছিন্ন করে বিশ্বের দরবারে সম্মানজনক জাতি হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যত বাধাই আসুক না কেন আজকের বিশ্ব ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই তা সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক নেতাদেরকে দেশপ্রেম সততা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাদের সত্যিকার দায়িত্বশীলতার প্রমাণ রাখতে হবে। তবেই সফল হবে জনগণের গণতন্ত্রের স্বপ্ন।

Dhaka University Institutional Repository

Bibliography

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

১. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০। নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা-২০০১, পৃঃ ১৯।

২. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৪৭-৫৭, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৯৪।

৩. মোস্তফা কামাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা, কাকলী প্রকাশনী।

৪. সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১ (রাজনৈতিক ইতিহাস ১ম খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি ফর বাংলাদেশ, ঢাকা।

৫. মো. মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, সময় প্রকাশনী ১৯৯৯, ঢাকা।

৬. লেলিন আজাদ, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ঃ রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা।

৭. এমএ ওয়াজেদ মিঞা, বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, ইউনিভাসিটি প্রেস লি.।

৮. মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অব.) বীর বিক্রম, একজন জেনারেল নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০০।

৯. ফেরদৌস হোসেন, রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, রাজনীতি গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা প্রথম সংখ্যা-১৯৯১।

১০. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশের তারিখ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮

১১. মেজর রফিকুল ইসলাম, স্বৈরশাসনের নয় বছর। ১৯৮২ -৯০। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাক-১৯৯১।

১২. মো. আবু নাসের টুকু, রাখি বর্মণ, সামরিক বাহিনী ও উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি, আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৬ ঢাকা।

১৩. অধ্যাপক ফেরদৌস হোসেন, গ্যাট থেকে ডব্লিউ টিও, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমাজ ও রাজনীতি, রাসেল লাইব্রেরি ১৯৮৭, ঢাকা।

১৫. মোঃ রফিকুল ইসলাম পিএসসি, সামরিক জান্তার রাজনীতি, আগামী প্রকাশনী ঢাকা-১৯৯২।

১৬. এমাজউদ্দিন আহম্মদ, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লি. ঢাকা-১৯৯৩।

১৭. হাসানুজ্জামান, বাংলাদেশে সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রক্রিয়া এবং জিয়া শাসন, মুস্তফা মজিদ (সম্পাদিত) রাজনীতিতে সামরিক আমলাতন্ত্র প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা-১৯৯৪।

১৮. এলাহী নেওয়াজ খান সম্পাদনায়, এরশাদের উত্থান পতন, ওয়েসিস বুকস্, ঢাকা-১৯৯১।

১৯. রুহুল আমিন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারা নেতৃত্ব, হীরা বুক মার্ট, ঢাকা-১৯৯৩।

২০. ফয়েজউদ্দিন আহম্মেদ, পাঁচ শতকের স্মৃতি কথা, পরমা প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৩।

২১. ইউসুফ মুহাম্মদ সম্পাদিত, অ্যালবাম, গণআন্দোলন (১৯৮২-৯০) ১ম খন্ড তোলপাড়, চট্টগ্রাম-১৯৯৩।

২২. মোহাম্মদ সোলায়মান, রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট : এরশাদের শাসনকাল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

২৩. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সম্পাদিত), গণআন্দোলন ১৯৮২-৯০, মুক্তধারা-১৯৯১।

২৪. মোহাম্মদ হান্নান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এরশাদের সময়কাল, আগামী প্রকাশনী-১৯৯১।

২৫. আতাউর রহমান খান, প্রধানমন্ত্রিত্বের ৯ মাস, নওরোড কিতাবিস্থান, ঢাকা-১৯৮৮।

২৬ আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐক্যমত্য, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা-১৯৯১।

২৭. মুনতাসির মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়, বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১৯৯৫।

২৮. মুহাম্মদ খোশবু, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (এরশাদের সময় কাল), স্টুডেন্ট ওয়েজ ঢাকা-১৯৯১।

২৯. ড. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের ক্রমবিকাশ।

৩০. ভাদিমির পুচকভ, বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা (১৯৭১-৮৫), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৮৮।

৩১. আতাউর রহমান খান, স্বৈরাচারের দেশ বছর, নওরোজ কিতাববিস্থান, ঢাকা-১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩২. ইব্রাহিম রহমান সম্পাদিত, দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী, জনকথা প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৩।

৩৩. মুনতাসীর মামুন, গণতন্ত্রের ক্রান্তিলগ্নে, খান ব্রাদার্স ঢাকা-১৯৯২।

৩৪. এম এম হামিদ (লে. কর্নেল), তিনিটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা, ঢাকা-১৯৯৩।

৩৫. আতাউর রহমান, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়ন স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের চালচিত্র ঃ রাজনীতির সামরিকীকরণ, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১।

৩৬. আবদুল গাফফার চৌধুরী, বাংলাদেশের সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রেসির লাড়াই, কাকলী প্রকাশনী ঢাকা-১৯৯১।

৩৭. আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র ৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়, প্রতীক প্রকাশনী , ঢাকা-১৯৯৫।

৩৮. ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম, সৈনিকের রাজনীতি, ইস্টওয়েস্ট পাবলিকেশন্স, লন্ডন এসডবিউ ১২৯ কিউ, আর ১৯৮৯।

৩৯. মোদাচ্ছের আলী, গণঅভ্যুত্থানের ও বাঙালির মধ্যবিত্ত সমাজ, অল্পকথা, ঢাকা-১৯৯৩।

৪০. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৫।

৪১. এমএস এম নাসিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি, ঢাকা ১৯৯২।

৪২. আব্দুল গাফফার চৌধুরী, বাংলাদেশের সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রেসির লড়াই, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯১।

৪৩. আব্দুল ওয়াহেদ তালুকদার, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র ৭০ থেকে ৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিপর্যয়, প্রতীক প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৫।

৪৪. ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম, সৈনিকের রাজনীতি, ইস্টওয়েস্ট পাবলিকেশন্স, লন্ডনএসডবিউ ১২৯ কিউ, আর ১৯৮৯।

৪৫. মোদাচ্ছের আলী, গণঅভ্যুত্থান ও বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ, অল্পকথা, ঢাকা ১৯৯৩।

৪৬. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা-১৯৭৫।

৪৭. এমএসএম, নাসিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা ১৯৯২।

৪৮. বদর উদ্দীন উমর, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, মুক্তধারা ১৯৮৫।

৪৯. জাওয়াদুল করিম, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম নেতৃত্ব, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯২।

৫০. আশরাফ কায়সার, বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

৫১. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এরশাদের পতন বিবিসিসহ বিদেশি গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯২।

৫২. নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৯১।

৫৩. আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার, ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, পান্ডুলিপি, ঢাকা-১৯৯৬।

৫৪. তালুকদার মনিরুজ্জামান, রাজনীতিরসমীকরণ প্রেক্ষিত : বাংলাদেশের রাজনীতির ১৯৮২-৯০, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা-১৯৯১।

৫৫. বাংলাদেশের রাজনীতি সঙ্কট ও বিশ্লেষণ, বাংলাদেশে কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ঢাকা-২০০১।

৫৬. গাজী শাসছুর রহমান, গণপ্রতাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য, বাংলা একাডেমী- ঢাকা-১৯৭৭।

৫৭. রেহমান সোবহান, বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রতক্ষদর্শীর ভাষ্য, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-১৯৯৮।

৫৮. শামসুর রহমান তারেক, বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স ১৯৯৯।

৫৯. হায়াত হোসেন, বাংলাদেশ ও গণতন্ত্রের সঙ্কট , চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায় প্রেস, চট্টগ্রাম, মে, ১৯৮৫।

ইংরেজি

৬০. Ahmed, Emajuddin, Bangladesh politics (Dacca: C S S, 1980)

৬১....ed. Military Rule and the Myth of Democracy (Dhaka: University Press Ltd, 1988)

৬২....ed. Bangladesh Shangshadiya Gonotantra Prashangik Bhabna (Dhaka: Karim Book Corporation, May, 1989)

৬৩....ed. Society and Politics in Bangladesh (Dhaka : Academic Publishers, 1989)

৬৪. Ahmad, Borhanuddin, The Generals of Pakistan and Bangladesh (Dhaka : Academic Publishers, 1989)

৬৫. Ahmed, Abul Mansur, Amar Dekha Rajnitir Panchesh Bachar (Dacca : Naoroj kitbistan, 1975)

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. Ahamed, Moudud, Bangladesh : Constitutional Quest For Autonomy (Dhaka: University Press Ltd. Second rend revied edition , 1991)

৬৭. Ali, M.M . Shawkat, Politics Development and Upazila (Dhaka: NILG , 1986) Almond, G.A. and coleman, J.S. eds. The politics of the Developing Areas (princeton : Princeton University Press, 1971)

৬৮. Al- Razee, Aleen, Constitutional Glimpses of Martial Law in India, Pakistan and Bangladesh (Dhaka : University Press Ltd, 1998)

৬৯. A.K. The Political Economy of Underdevelopment (Cambridge : Cambridge University Press, 1985)

৭০. Ball R. Allen, Modern politics and Government 2nd edition (London : The Macmillan Press Ltd. 1997)

৭১. Barker, Rodney ed. Studies in Opposition (London : Macmillan . 1971) .

৭২. Bertsch, G.K. ed Comparing Political systems : Power and Politics in Three Worlds 2nd ed .(New York: John Wiley & Sons, 1978)

৭৩. Bhuiya, Abdul Wadud, Emergence of Bangladesh and Role Awami League (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt, Ltd , 1982)

৭৪. Burger, A.S. Opposition in a Dominant Party System

i. (Bombay : Oxford University Press, 1969)

৭৫. Choudhury, Dilarar, Bangladesh and the South Asian Interantional System (London: Scorpion Publishers, 1992)

৭৬. Constituional Development in Bangladesh : Strernational system (London: Scorpion Publishers, 1995)

৭৭. Chowdhury, Najma, The Legislative in Bagladesh : Politics and Functioning of the East Bangal Legislature 1947-58 (Dhaka University, 1980)

Dhaka University Institutional Repository

৭৮. Curitis, Michael, Comparative Government and Politics 2nd ed (New York : Harper & Row publishers, 1978)

৭৯. Deadlier, The Role of the Military in Emerging Countries (The Hague: Mouton, 1962)

৮০. Dahl, Robert A. ed. Political Oppositions in westetr Democracies (New Haven: Yale University Press,)

৮১....ed. Poliarchy participation (New Haven, 1971)

৮২....ed. Ragimes and Opposition (New Haven: Yale University press, 1973)

৮৩. Duverger, Maurice Political parties (London : Methuen & co 1954)

৮৪. Emerson Rupert, Political Mondernization, (Denver : University of Denver Press, 1963)

৮৫. Feldman, Herbert, Revolution in pakistan: A Studay of Martial Law Administration, (London : Oxford University press, 1969)

৮৬. Finer, S.E. The Man on Horseback (London: Pall Press, 1969)

৮৭. Franda, Marcus, Bangladesh the First Decade (New Delhi: South Asian Publishers, Pvt. Ltd. 1982)

৮৮. Fridrich, Catl J. Constitutional Goverbnment and Democracy 4th ed. (Calcutta : Oxfird & TBH Publishing co 1966)

৮৯. Hafiz, Abdul and Rob, K.A. Nation Building kin Bangladesh (Dhaka : BIISS, 198

৯০. Hakim, Muhammad A. Bangladesh Politics The Shahabuddin Interregnum (Dhaka: University Press Ltd. 1992)

৯১. Harun, Shamsul Huada, Parliamentary Behaviour in a Muliti – National State 1947 – 56 Bangladesh Experience, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1984)

Dhaka University Institutional Repository

৯২. Hasanuzzaman, Al Masud, Bangladesh: Crisis of Political Development (Department of Govt Politics Jahangirnagar University, 1988)

৯৩. Held, David, Model of Democracy (Cambridge: Polity press, 1987)

৯৪. Huntington, S.P. The Soldier and the State (Cambridge : Harvard university Press, 1957)

৯৫. Hussain, Shawkat Ara, Politics and Society in Bengal (Dhaka: Bangal Academy, 1991)

৯৬. Jahan, Rounaq, Pakistan Failure in National Integration (New York: Columbia University press, 1972)

৯৭. Jahan, Rounaq, Bangladesh Politics : Problems and Issues (Dhaka : University Press Ltd. 1987)

৯৮. Johnson, J. J, The Role of the Military in Underdeveloped Countries (Princeton : Princeton University Press, 1962)

৯৯. Key, V. O . Jr. Politics, Parties 2nd ed (N. H. Gibbs, 1952)

১০০. Khan, M. M. and The eds Bangladesh; Society Politics and Bureaucracy (Dhaka : CENTAS ,1984)

১০১. Khan, M. M. and Zafarullah H. M. eds. Politics and Bureaucracy ub a New Nation Bangladesh (Dacca: CRNTAS, 1980)

১০২. Khan. Zillur Rahman, Martial Law to Martial Law Leadership Crisis in Bangladesh (Dhaka: University Press Ltd, 1985)

১০২. khan, Zillur Rahman and khan Serajul Alam, Constion and Constitutional Issues (Dhaka: University press Ltd. 1985)

১০৩. Kukreja Veena, Civil-Military Relations in south Asia (New Delhi: Sage Publications 1991)

১০৪. La Palombara, J. and Weiner, Myron eds. Politics, Parties and Polititical Development (Princeton Univ Press, 1966)

Dhaka University Institutional Repository

১০৫. Maniruzzaman, Talukder, Radical Politics and the Emergence of Bangladesh (Dacca: Bangladesh Book Int Ltd. 1975)

১০৬....ed. Group Interests and Political Changes Studies of Pakistan and Bangladesh (New Delhi: South Asia Publishers, 1982)

১০৭....ed. The Bangladesh Revolution and its Aftermath (Dhaka: University Press Ltd. 1988)

১০৮....ed. Military withdrawal From Politics A Case Study (Dhaka : University press Ltd. 1988)

১০৯....ed. Politics and Security of Bangladesh, (Dhaka : University Press Ltd. 1994)

১১০. Mayo H. B. Introduction to Democratic Theory (New York : Oxford University Press , 1960)

১১২. Mclennan, Barbara. N. ed Political Opposition and Dissent (New York: Dunellen pub. Co. Inc. 1967)

১১৩. Merkl Peter M. Political Continuity and Change (Bombay : Allied Publishers Private Ltd. 1967)

১১৪. Mills, C. W. The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956)

১১৫. Osmany, Shireen Hassan, Bangladesh Nationalism History of Dialectics and Dimensions (Dhaka : University Press Ltd. 1992)

১১৬. Powell G. Bingham Jr. Contemporary Democracies : Participation, Stability and violence (Cameroon : Harvard Univ. Press, 1982)

১১৭. Preston. P.W. Theories of Development (London : Rouledge and kegan paul, 1982)

১১৮. Rahman, Atiur, SAARC Political Economy (Dhaka : University Press Ltd. 1985)

Dhaka University Institutional Repository

১১৯. Rahman, Atiur, Prsasnts and Classes (Dhaka: University Press Ltd. 1986)

১২০. Ram, D. Sundar, Role of Opposition Parties in Indian politics (New Delhi : Deep & Deep Publications 1992)

১২১. Sabine, George, H A. History of Political Theory 3rd ed. (London: G. Harrap & Co. Ltd. 1968)

১২২. Sartori, Geovnni, Democratic Theory (New York: Fredrick A. Praeger 1965)

১২৩. Sen, Ranglal, Political Elites in Bangladesh (Dhaka: University Press Ltd. 1986)

১২৪. Shelly, Mizanur Rahman, Emergence of a New Nation in Multi- Polar World: Bangladesh (Dhaka: Univ. press Ltd,1971)

১২৫. Shils, Edward, Government and Opposition (London: Macmillan, 1971)

১২৬. Smith, Joel, et al Legislatures in Development (Durham: Duke University press, 1979)

১২৭. Soe, Christian, Comparative Politics 86/87 (Connecticut : The Dushkin Publishers Group, 1986-7)

১২৮. Umar, Badruddin, Politics and Society in East Pakistan and Bangladesh (Dacca : Mowla Brothers, 1974)

১২৯. Varma, S. P. Modern political Theory (New Delhi : Vani Educational Books , 1986)

১৩০. Wood, Geof, D. Bangladesh whose Ideas Whose Interests (Dhaka : University Press Ltd. 1994)

১৩১. Ziring, Lawrence, Bangladesh From Mujib to Ershad an Interpretive study (Dhaka : University Press Ltd. 1992)

Dhaka University Institutional Repository

১৩২. Ahmed Moudud, Democracy and the Challenge of Development. A Study of Politics and Military Intervention in Bangladesh, Dhaka University Press Ltd. 1095.

১৩৩. Bienen Hinry (ed.) The Military Intervenes : Case Studies in Political Development New York, Russell Sage, 1968.

১৩৪. Daider Hans, The of Military in the Emerging Countries, Denhaag Mouton and Co. 1962.

১৩৫. Hakim S Abdul, Begum Khaleda Zia of Bangladesh : A Political Biography, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1992

১৩৬. Hossain, Golam. General Ziaur Rahman and the BNP, Political Transformation of a Military Regime, Dhaka: University Press Ltd. 1988

১৩৭. Islam Rafiqul, Nine years of Autocratic Rule, 1982-90 (Bengali) Dhaka; University press Ltd. 1991.

১৩৮. Uanowitz Morris The Military in the Political Development of New Nations. Essays in Comparative analysis, Chicago; The University of Chicago Press, 1964.

১৩৯. Khan, Zillur Rahman, Form Martiasl Law to Martial Law : Leadership Crisis in Bangladesh, Dhaka: University press Ltd. 1985.

১৪০. Muhith A. M. A, Bangladesh: The Emergence of a Nation, Dhaka Bangladesh Books International, 1979.

১৪১. Ziring Lawrence, Bangladesh. Form Mujib to Ershad, An Interpretive Study, Dhaka: University Press Ltd. 1992.

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ

১. এমাজউদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনীতিক নির্ভর ও দলছুট প্রবনতা, সাপ্তাহিক বিক্রম, ঢাকা-১৯৮৮।

২. Talukder Moniruzzaman Civilization of Military Regimes, A comparative Analysis, Biss Journal. Vol.1.1980.

৩. Md. Ataur Rahman, æBangladesh in 1983: A Turning Point for the Military, Asian Survey, 24:2 (February 1984, P. 240

৪. Ahmed Emajuddin, Crisis of Democracy in Bangladesh' S. Khan ed Politics and stability in Bangladesh Problems and Prospects (Deptt. of Govt & Politics J.U 1985)

৫. Ahmed, EmajUddin,Crisi of Liberal Democracy on South Asia. The Journal of Political Science, Vol. II. Issue-1, 1985)

৬. Aminuzzaman, Salahuddin Institutional Process and Practices of Adminstrative Accountability : Role of Jatiyo Sangsad (Parliament) in Bangladesh' south Asia Studies Vol .10 no .2 July

৭. Barone, Michael, Democracy and Politics Dialogue N0. 103. 1/1994

৮. B'axter, Craig Bangladesh in 1990 another New Beginning Asian Survey. Vol. XXXI No.2.19

৯. Baxter, Craig, Bangladesh : A Parliamentary Democracy, If the can Keep It Current History March 1992

১০. Berfocci, Peter, Bangladesh in 1985 Resolute Against the Storms in Asian Survey Vol, XXXVI, No.2, 1985

১১. Bhuiya A. Wadud, Persistent Praetorians Bangladesh's Second Military Regime' Journal of Political Science Association June, 1986,

১২. Carey James, James, W. 'The Mass Media and Democracy' Journal of Inter national Affairs, Summer, 1993

Dhaka University Institutional Repository

১৩. Choudhury, Dilara, Defmocracy in Bangladesh: Problems and prospects Asian Studies, No. 12, 1993

১৪. Haider, M. Zaglul, The Blkoodless Military Coup in Bangladesh The Journal of Political Science Vol. II Issue-1 1985

১৫. Halpern M. Middle Eastern Armies and the New Middle Class. Johnson, J.J. ed. The Role of the Military in Undeveloped Countries (Princeton : Princeton Univ . Press, 1962)

১৬. Haque, Azizuel, Zia's Politics & Strategies: A Peep Into Their Limitations Asian Studies, No. 13, 1994

১৭. Hoque A. N. Shamsul, Nation Building in Bangladesh : The process of Institutional Building, Hafiz and Kahn Nation Building in Bangladesh (Dhaka : BIISS, 1986)

১৮. Haque and Akhter, Militarization and Opposition in Bangladesh : Parliamentary Approval and Public Reaction, Journal of Commonwealth and comparative Politics 27:2, July 1989

১৯. Islam, Syed serajul, Is Civic Culture Essential for Democracy' The Journal of political science Vol.II, Issue-1, 1985

২০. Islam, Syed Serajul, Bangladesh in 1986 Entering a new Phase' Asian Survey Vol. XXVI, No. 2, 1987

২১. Kabir, B.M. Monoar, Movement and Elections : Legitimization of the Military Rule in Bangladesh' Political Science Association Journal, Dhaka, 1988

২২. Khan, M.M. and Zafarullah H.M. The 1979 Parliamentary in a New Nation Bangladesh (Dacca : CENTAS, 1980)

২৩. Kan Zillur Rahman, Bangladesh in 1981 : Change, Stability and Leadership' Asian Survey 22:2, February, 1982

Dhaka University Institutional Repository

২৪. Muravchik, Joshua Review Essay Exporting Democracy' ORBIS; Fall,. 1993

২৫. Nordlinger, Eric, Soldier in Mufti: The Impact of Military Rule Upon Economic and Social Change in Non Western states, American Political Science Review 64 (4), Dec 1970

২৬.Novak Michael, Democracy : The Collapse of Alternatives' Freedom at Issue May / June, 1990

২৭. Pye, Lucian W The Now–Western Political Process Journal of Politics 20, No, 3, Aug, 1958

২৮. Pye, Lucian W. Armies in the Process of Political Modernization Johnson, J. J. ed The Role of the Miliary in Underdeveloped Countries (Princeton: Princeton Univ. Press, 1962)

২৯. Rahman, M. Ataur, Bangladesh in 1982 : Beginnings of the Second Decade Asian Survey Vol XXll I No.2 1993

৩০. Rahman Mahbubr, Dysunctional Aspects of Political Order in Bangladesh The Jahangirnagar Review Part- II Vol XI & XII 1986-88

৩১. Rehman, syedur, Bangladesh in 1988 Precarious Institution- Building amid Crisis Management Asian Survey Vol. XXIX, No.21989

৩২. Rashiduozzaman, M, 'Changing Political Patterns in Bangladesh Internal Constraints and External Fears' Asian Survey Vol. 17, No .9 September 1977

৩৩. Shils, Edward, Political Development in New States II, Comparative Studies in Society and History Vol. II 1959-60

৩৪. Sultan, Naim, Intervention and Role of Military in Third World Societies: Theoretical perspectives' Asian Studies No. 13, 1994

৩৫. Wayne, Stephen J. Political Parties in the United States (Mimeo) 1993

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. Zaman, M, Q, Ziaur Rahman : Leadership Styles and Mobilization Process' khan and Thorp eds. Bangladesh Society, Politics and Bureaucracy' Dhaka: Centas 1948)

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা (বাংলা ও ইংরেজি)

দৈনিক ইত্তেফাক (ঢাকা) (১৯৮২-৯১-এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক বাংলা (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক সংবাদ (ঢাকা) (১৯৮২-৯১ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক বাংলার বানী (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক বাংলার বানী (ঢাকা) (১৯৮২-৯৩ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক দেশ (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক ইনকিলাব (ঢাকা) (১৯৮৩-৯১ বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক সংগ্রাম (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

সাপ্তাহিক ছুটি (ঢাকা) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ (ঢাকা) (১৯৯০-৯১ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

সাপ্তাহিক বিচিত্রা (ঢাকা) (১৯৯০-৯১ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

The Bangladesh Times (Dhaka) (১৯৮২-৯১ বিভিন্ন সংখ্যা)

The Bangladesh Observer (Dhaka) (১৯৮২-৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

The Times (London) (১৯৪৭-৭৫ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

Weekly Holiday (Dhaka) (১৯৭৫ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

Unpublished Thesis (M. Phil & Ph. D)

নাসিমা খাতুন, এমফিল অভিসন্দর্ভ বাংলাদেশের রাজনীতি (১৯৮২-৯০), অপ্রকাশিত, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল, এমফিল অভিসন্দর্ভ, 'এরশাদের শাসনামল : একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ' ২০০২।

অপ্রকাশিত, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্ট প্রচারপত্র

১. গণঅভ্যুত্থান বুলেটিন-২, ঢাকা-১৯৯০।

২. ছাত্র ঐক্যের বুলেটিন : ৩ ডিসেম্বর-১৯৯০, প্রকাশক ছাত্র ঐক্য

৩. জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে গণতন্ত্রকামী ও দেশপ্রেমিক পুলিশ বাহিনীর একাত্মতা ঘোষণা (প্রচারপত্র) গোপন সার্কুলার নং ১, ০৩/১২/১৯২০

৪. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যৌথ পরিষদ, সরকারি কর্মচারীদের প্রতি খোলা চিঠি, ০৭/১১/১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

'এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা'

(এমফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণের প্রশ্নমালা।

(সংগৃহীত তথ্যাবলি শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

১. নাম :

২. বয়স :

৩. পেশা :

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৫. আয়ের উৎস :

৬. কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থক কি না .....?

৭. কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কি না.....?

৮. পূর্বে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কিনা?

৯. সামরিক শাসন সমর্থন করেন কিনা .....?

১০. সামরিক শাসন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি.....?

১১. এরশাদের সামরিক শাসনকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন .....?

১২. এরশাদের শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা মূল্যায়ন করবেন.....?

১৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর অবস্থান কি হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

১৪. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

১৫. এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আপনার ভূমিকা কি ছিল ?

১৬. এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন সফল হতে দীর্ঘ সময় লাগে কেন ?

১৭. এরশাদ সরকারের সবচেয়ে দূর্বলতর দিক কি ছিল ?

১৮. তিন জোটের রুপরেখা নিয়ে আপনার মতামত কি ?

১৯. ১৯৮৬ সালে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটের নির্বাচনে যাওয়া সম্মন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

Dhaka University Institutional Repository

'এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা'

(এমফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণের প্রশ্নমালা।

(সংগৃহীত তথ্যাবলি শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

১. নাম :

২. বয়স :

৩. পেশা :

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৫. আয়ের উৎস :

৬. কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থক কি না .....?

৭. সামরিক শাসন সমর্থন করেন কিনা .....?

৮. সামরিক শাসন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি.....?

৯. এরশাদের সামরিক শাসনকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন .....?

১০. এরশাদের শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা মূল্যায়ন করবেন.....?

১১. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর অবস্থান কি হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

১২. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

১৩. এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আপনার ভূমিকা কি ছিল ?

১৪. এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন সফল হতে দীর্ঘ সময় লাগে কেন ?

১৫. এরশাদ সরকারের সবচেয়ে দূর্বলতর দিক কি ছিল ?

১৬. তিন জোটের রুপরেখা নিয়ে আপনার মতামত কি ?

১৭. ১৯৮৬ সালে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটের নির্বাচনে যাওয়া সম্মন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

Dhaka University Institutional Repository

'এরশাদ শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা'

(এমফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণের প্রশ্নমালা।

(সংগৃহীত তথ্যাবলি শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

১. নাম :

২. বয়স :

৩. পেশা :

৪. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৫. আয়ের উৎস :

৬. কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা সমর্থক কি না .....?

৭. সামরিক শাসন সমর্থন করেন কিনা .....?

৮. সামরিক শাসন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি.....?

৯. এরশাদের সামরিক শাসনকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন .....?

১০. এরশাদের শাসনামলে বিরোধী দলের ভূমিকা মূল্যায়ন করবেন.....?

১১. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনীর অবস্থান কি হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

১২. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

১৩. এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে আপনার ভূমিকা কি ছিল ?

১৪. এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন সফল হতে দীর্ঘ সময় লাগে কেন ?

১৫. এরশাদ সরকারের সবচেয়ে দূর্বলতর দিক কি ছিল ?

১৬. তিন জোটের রুপরেখা নিয়ে আপনার মতামত কি ?

১৭. ১৯৮৬ সালে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোটের নির্বাচনে যাওয়া সম্মন্ধে আপনার মূল্যায়ন কি ?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

জেনারেল এরশাদের সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্র

Registered No. DA-1

The Bangladesh

Extraordinary

Published by Authority

Wednesday, March 24,

GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
PROCLAMATION OF MARTIAL LAW

WHERAS a situation has arisen in the country in which the economic life has come to a position of collapse, the civil administration has become unable to effectively function.

wanton corruption at all levels has become permissible part of life causing unbearable sufferings to the people, law and order situation bad deteriorated to an alarming state seriously threatening peace, law and order situation has deteriorated to in alarming state seriously threatening peace, tranquility, stability and life with a dignity and bickering for power among the members of the ruling party ignoring the duty to the jeopardizing national security and sovereignty

And

WHERAS the people of the country have been plunged into a state of extreme frustration despair and uncertainty

And

WHERAS in the greater national interest and also in the interest of national security it has become necessary to place our hard earned country under Martial Law and the responsibility has fallen for the same upon the Armed Forces of country as a part of their obligation towards the people and country,

Dhaka University Institutional Repository

Now, thererefore, I, Lieutenant General Hussain Mohammad Ershad, with the help and mercy of Almighty Allah and blessings of our great patriotic people, do hereby taka over and assume all and full powers of the Government of the People's Republic of Bangladesh with immediate effect from Wednesday, 24th March, 1982 as Chiel Martrial Law Administrator of the People's Republie of Bangladesh and do hereby declare that the whole of Bangladesh shall be under Martial Law immediate effect Along with assuption of powers of Chief Martial Law Administrator I do hereby assume the full command and control of all the Armed Forces of Bangladesh .

In exercise of all powers enabling me in this behalf, I. Lieutenant General Hussain Muhammad Ershad do hereby futher declare that:

a. I have assumed and entered upon the office Chief Martial Law Administrator with effect from Wednesday, 24th March, 1982.
b. I may nominate any person as President of the country time and who shall enter upon the office of the President after taking oath before Chief Justice of Bangladesh or any judge of the Supreme Court designated by me. I may resignd or cancel such nomination from time to and nominate another person as the President of Bangladesh. The President so nominated by me shall be the head of state and act on and in accordance with may advice as Chief Law Administrator and perform such function as assigned to him by me. This Proclamation, Martial Law Regulations orders and other Orders/Instructions made by me during their continuance shall be the supreme law of the country and if any other law is inconsistent with them that other law shall to the extent of inconsistency by void.

I may by order notified in the official Gazette amend this Proclamatiom.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

এরশাদ সরকারের গোপনীয় পত্রাদি

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গোপন নথি থেকে

সরকার সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কার্যক্রমে ভীত হয়ে পড়েছিল শুরুতেই। তারা বুঝত এ ঐক্য ভাঙ্গতে না পারলে তার পতন অনিবার্য । তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় তৈরি করেছিল এক নীল-নকশা । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নথি থেকে সেই নীল-নকশার অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলো :

১. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে পরিণত হচ্ছে। বর্তমান সরকারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করছে সবদলীয়া ছাত্রঐক্য । আন্দোলনের এ ধারাকে এখন বন্ধ করা এবং আন্দোলন বিরোধী কর্মসূচি প্রণয়ন করা দরকার। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ছাত্রঐক্য কোনো নির্দিষ্ট ইস্যু ও কর্মসূচিতে ঐক্যবদ্ধ নয় এবং তাদের মধ্যে আদর্শগত কোনো ঐক্য নেই। ছাত্রঐক্যের কর্মসূচিকে মোকাবিলা করার জন্যে তাই কিছু বাস্তব কর্মসূচি দরকার । সুতরাং ছাত্রদের সরকার সমর্থকে পরিণত করার জন্যে সরকারের তরফ থেকে সংগঠিত করা অনতিবিলম্বে খুবই প্রয়োজন । যদি এ মুহূর্তে ছাত্রদের সংগঠিত করতে যোগাযোগ স্থাপন করা। যা হোক, এ ব্যাপারে কোনো পাল্টা কর্মসূচি নেয়ার আগে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যকে বিভক্ত ও অস্থিতিশীল করার জন্যে সক্রিয় কর্মসূচি নিতে হবে।

২. সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বিভিন্ন আদর্শ ও চিন্তার সংমিশ্রণ। ডাকসু ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়েই ঐক্য গঠিত। এসব ছাত্র সংগঠনের ও জাতীয় রাজনীতিতে যেসব মতপার্থক্য রয়েছে, তাদের মধ্যেও আছে।

(ক) ৭৫ পূর্ব ৭৫ উত্তর রাজনীতি, (খ) বাঙালি বনাম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, (গ) ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বরের মর্যাদা ও গুরুত্ব, (ঘ) আন্তর্জাতিক নীতি ও অবস্থান ।

৩. উপরোক্ত ৪টি বিষয়ে এবং জয়বাংলা ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ প্রশ্নে ছাত্র সংগঠনগুলোতে পার্থক্যে বিদ্যমান এবং তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মাত্র কিছুদিন আগেও ক্যাম্পাসে উত্তপ্ত দৃশ্যের অবতারণা করেছিল । এ সমস্ত পার্থক্যের বিষয়গুলোকে সুকৌশলে নড়াচড়া করতে হবে এবং ছাত্রদের মধ্যে সেগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এগুলো কার্যকরী করার জন্য কিছু বিশ্বাসভাজন মধ্যমানের জেলবন্দি ও জেলের বাইরের নেতাকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে খুঁজে পেতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অবিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে হবে। যেমন- বিরোধীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে অমুক ছাত্র সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে অথবা অমুক ছাত্রনেতা সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছে। কিন্তু শুধু প্রচার/প্রপাগান্ডা দ্বারা সফল হওয়া যাবে না। সুতরাং কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন কিছু ছাত্রনেতার সঙ্গে আমাদের বৈঠক করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে যদি আলোচনা ব্যর্থ হয় তবে তা গোপন রাখা অথবা প্রকাশ করা যেতে পারে। এসব বৈঠক/আলোচনায় রাজনৈতিক নেতার গ্রুপ ছাড়াও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা থাকবেন অথবা ইন্টেলিজেনস সার্ভিসের কর্মকর্তা থাকবেন। তাদের পরিচয় ছাত্রনেতাদের কাছে গোপন রাখা হবে। এদের বৈঠকের আগে সব প্রস্তুতি করে ফেলা হবে।

৫. এ পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দলের ১০ জন বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রনেতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের নাম সরকার আলোচনা করে সফলকাম হবে বলে মনে হয়েছিল ।

৬. ওই ছাত্রনেতাদের সরকারি কূটনৈতিক চাকরি ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার লোভ দেখানো হবে। যদি প্রলোভনে কাজ না হয় তবে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আনার মতো জনপ্রিয় প্রতিশ্রুতির স্বার্থে সব ধরনের সরকারি সহযোগিতা দেয়া হবে। এরপর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (হা-আ) এর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির কৌশল প্রয়োগ করা হবে। প্রাক্তন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ছাত্রদলের অনৈক্যকে উসকে দেয়া হবে। যেমন একথা ছড়িয়ে দিতে হবে, ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের সহিংসতায় অধুনালুপ্ত ছাত্র সমাজকে সরকার ব্যবহার করেছিল। এমনকি শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘাতের ব্যবহার করতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলো সুচিন্তিত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক ফায়দা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

গণঅভ্যুত্থান বুলেটিন-১

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর, ১৯৯০

গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে স্বৈরশাসনের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠছে-

১। গত ২৭ থেকে ৩০ নভেম্বর ও আজ ১ ডিসেম্বর ঢাকা শহরের মগবাজার, মালিটোলা, মৌচাক, যাত্রাবাড়ী, পল্টন, শুক্রাবাদ, কলাবাগান, হাতিরপুল, মিরপুর, ডেমরা ও আজিমপুরসহ অন্যান্য এলাকায় নিরস্ত্র জনতা এরশাদের সশস্ত্রবাহিনী ও অস্ত্রসজ্জিত মাস্তানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সারা দেশে এ পর্যন্ত এ সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন ৭৫ জনের বেশি, আহত হয়েছেন ৫ সহস্রাধিক। আজ মিরপুরে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন ৮ জন ও খুলনায় একজন ।

২। সামরিক বাহিনী, বিডিআর ও তাদের ক্যাডার বাহিনী ১৯৭১-এর মতো এখন বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করছে, নিরীহ মা-বোন ও শিশুদের অত্যাচার করছে, নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে। গত শুক্রবার গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণকারী মুসল্লিদের সামরিক বাহিনী নির্মমভাবে পিটিয়েছে। আজ প্রেসক্লাবের সম্মুখে দেশের বরেণ্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। চট্টগ্রামে ডাক্তার মিছিলে সেনা ট্রাক তুলে দেয়া হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে খালি হাতে ছাত্র-জনতা এখন মিছিলে যাচ্ছে।

৩। ঢাকা শহরসহ সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া ও ফেনী সর্বত্রই এরশাদের খুনি বাহিনীর বিরুদ্ধে ছাত্রজনতা আঘাতের পর আঘাত হানছে। আন্দোলনের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, কৃষি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষকরা পদত্যাগ করেছেন, ডাক্তাররা অবিরাম ধর্মঘট করেছেন, সাংবাদিকরা পত্রিকা বন্ধ রাখছেন, বেতার টেলিভিশনের শিল্পীরা অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন (যে অনুষ্ঠান এখন দেখানো হচ্ছে তা পূর্বে ধারণকৃত অথবা প্রচারিত অনুষ্ঠান)। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও যুব সংগ্রাম পরিষদ, বিচার বিভাগ ও সামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে।

৪। নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

Dhaka University Institutional Repository

৫। প্রতিটি মহল্লা, পাড়া, গ্রামগঞ্জে গণপ্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলুন এবং বিভিন্ন প্রতিরোধ কর্মসূচির মধ্যদিয়ে এরশাদ বাহিনীকে প্রতিরোধ করুন ও তার সহযোগীদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন। সর্বক্ষেত্রে অবৈধ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করুন।

৬। আপনার এলাকায় শহীদ পরিবার ও আহতদের সর্বাত্মক সাহায্য করুন। বিশেষ করে আন্দোলন অংশগ্রহণকারী গরিব ও মেহনতি মানুষকে সহযোগিতা করুন।

৭। তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বান অনুযায়ী সব ধরনের সরকারি কার্য, সব যানবাহন চলাচল (রিকশা ছাড়া) বন্ধ রাখুন ও বিক্ষোভ অব্যাহত রাখুন। প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলন পরিবহন শ্রমিকরা অবিরাম ধর্মঘটের কর্মসূচি জানিয়েছে।

পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর প্রতি : আপনারা কাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য আপনার ভাই-বোন সন্তানদের গুলি করছেন। আজ বিশ্বের সবাই জানে যে, এরশাদ হচ্ছে এক নম্বর লম্পট, লুটেরা ও বিশ্ব বেহায়া। তাকে সহযোগিতা না করে নিজেদেরকে জনগণের ঘৃণা থেকে রক্ষা করুন। বুলেটিন নিজে পরুন, অন্যকে পরতে দিন ও কপি করে বিলি করুন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

শেখ হাসিনার ভাষণ

৪ ডিসেম্বর রাতে এরশাদের পদত্যাগ সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরদিন রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে পুনঃপ্রচারিত ভাষণ :

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা। আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন। চলমান গণতান্ত্রিক আন্দালনকে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত করতে বাংলার মায়ের দামাল ছেলেরা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন, আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। তাদের শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি, আহতদের জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। স্বজন হারানোর দুঃসহ বেদনা নিয়ে যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক সহমর্মিতা।

এ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কৃষক-ছাত্র-শ্রমিক-জনতার পাশাপাশি শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, রেডিও-টিভির শিল্পী, কলাকুশলী, সংস্কৃতিসেবী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী যারা রাজপথের সংগ্রামে শামিল হয়েছেন, তাদের জানাচ্ছি বিপ্লবী অভিনন্দন। গ্রেফতার হয়ে যারা কারাগারে অসহায় কষ্ট স্বীকার করেছেন তাদের জানাচ্ছি সমবেদনা।

বাংলার কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতা তথা সর্বস্তরে জনগণ স্বৈরাশাসন বিরোধী রক্তক্ষয়ী যে বীরত্বপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করেছিল তার বিজয়ের ধারা সূচিত হয়েছে। বীর ছাত্র-জনতার এ বিজয়ের মূল্য যে কোনো মূল্যে অব্যাহত রাখতে হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পযর্ন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শত শহীদের আত্মাহুতির বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের অগ্রযাত্রাকে যাতে কোনো অশুভ হাত ব্যাহত করতে না পারে তার প্রতি আন্দোলনরত সব শক্তিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার আলোয় ৩ জোট কর্তৃক ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশ সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হয় জনগণ যাতে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেই পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে দেশবাসী যেমনিভাবে চলমান আন্দোলনকে বর্তমান পর্যায়ে এনে উপনীত করেছেন, তেমনিভাবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অতীতের ন্যায় দৃঢ় ভূমিকা পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

শত শহীদের রক্তের প্রতি আমাদের এ অঙ্গীকার পালনে আমি দেশবাসীর সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা কামনা কারছি।

যে মুহূর্তে ঐক্যমত ভিত্তিক ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী একটি অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত প্রয়োজন। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। আইন নিজেদের হাতে তুলে নেবেন না। দোষীদের অবশ্যই আইনানুগ বিচার করা হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাঙালি জাতি আর কোনো দিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। ইনশা আল্লাহ জনতার জয় হবেই। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু। জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

খালেদা জিয়ার ভাষণ :

৪ ডিসেম্বর রাতে এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা। পরদিন রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে পুনঃপ্রচারিত ভাষণ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, প্রিয় দেশবাসী

আসসালামু আলাইকুম, আমি খালেদা জিয়া বলছি,

আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। দীর্ঘ ৯ বছরের আন্দোলন ও শত শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমাদের বিজয় সূচিত হয়েছে। সেজন্য মহান আল্লাহতালার দরবারে আমি শুকরিয়া করছি সঙ্গে সঙ্গে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আন্দোলনের সেই বীর শহীদদের এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি দেশবাসীকে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের সবার আন্দোলনের ফলে স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়েছে কিন্তু আন্দোলনের মূল লক্ষ্য গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একটি সুখী সমাজ গড়ে তোলার কাজ আমাদের শুরু করতে হবে। এ পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর। আজ এজন্য আমাদের সবাইকে হতে হবে ধৈর্যশীল ও সংযমী। ভাবাবেগে জড়িত যেকোন ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। পরিণাম দেশ ও জনগণের জীবনে নেমে আসবে হতাশা। আমরা খবর পেয়েছি আন্দোলনের বিজয়ে উল্লাস ও উচ্ছ্বাসে দেশের কোনো কোনো জায়গায় কিছু উচ্ছৃঙ্খল ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। প্রতিহিংসা বা ব্যক্তি শত্রুতার কারণে প্রতিপক্ষের ওপরে আক্রমণ এবং বিষয় সম্পত্তি বিনষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই আন্দোলনের সব নেতাকর্মী ও দেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন, আপনারা এ মুহূর্তে ভাবাবেগ সংযত করুন ও ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিন। আপনাদের কোনো কাজ বা আচরণ যাতে জনজীবনের শান্তি বিনষ্ট এবং আন্দোলনের ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সবাইকে মনে রাখতে হবে শান্তি, সংযম ও শৃঙ্খলাই আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারে।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।